# একুশে ফেব্রুয়ারী

জহির রায়হান

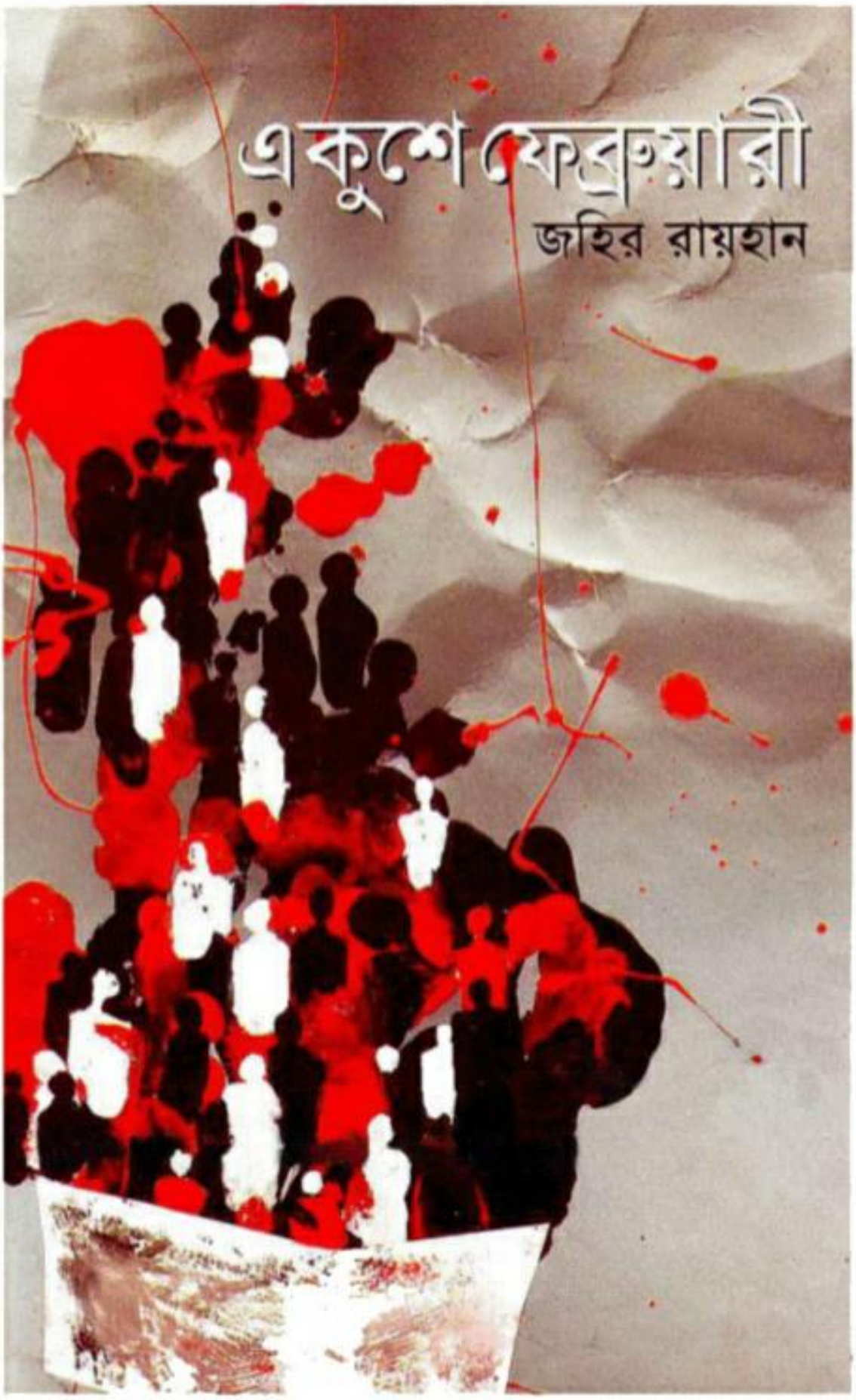

# ভূমিকা

বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন শুধু এদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নতুন চেতনাপ্রবাহ সৃষ্টি করেছিলো। এই চেতনা ছিলো অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক মূল্যবোধসঞ্জাত। আমাদের শিল্প সাহিত্যে যাঁরা এই চেতনার ফসল, তাঁদের ভেতর জহির রায়হানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ভাষা আন্দোলনে তিনি শুধু যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তা নয়, তাঁর সাহিত্য প্রেরণার মূল উৎস ছিলো এই আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের উপর প্রথম সার্থক উপন্যাস— 'আরেক ফাল্গুন'–সহ অজস্র ছোটগল্প ও নিবন্ধ লিখেছেন তিনি। এইসব লেখা এবং তাঁর রাজনৈতিক অঙ্গীকার থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা আন্দোলনের আবেগ, অনুভূতি তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আপ্লুত করে রেখেছিলো।

লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর জহির রায়হান চলচ্চিত্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন পঞ্চাশ দশকের শেষে। এই শিল্প মাধ্যমটির প্রতি তাঁর যোগাযোগ অবশ্য আরো আগের।

ষাট দশকের শুরুতে জহির রায়হান একজন পরিপূর্ণ চলচ্চিত্রকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন 'কখনো আসেনি', 'কাঁচের দেয়াল' নির্মাণের মাধ্যমে। এরপর অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে কয়েকটি বাণিজ্যিক ছবি বানালেও তিনি তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। বাণিজ্যিক ছবি বানাবার সময় তাঁর শিল্পসত্তা যতটুকু বিপর্যস্ত হয়েছিলো, যে তীব্র মানসিক যাতনার শিকার হয়েছিলেন তিনি— কিছুটা লাঘবের জন্য আবার সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন, উপন্যাস লিখেছেন 'হাজার বছর ধরে।' 'ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি' আর 'কতগুলো কুকুরের আর্তনাদ'–এর মতো গল্প লিখে জ্বালা মেটাতে চেয়েছেন।

'কাঁচের দেয়াল' বানাবার পর তিনি 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তবে শিল্পোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায়িক দিক থেকে তিনটি অসফল ছবি (কখনো আসেনি, সোনার কাজল ও কাঁচের দেয়াল) বানাবার ফলে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' প্রযোজনা করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। বাধ্য হয়ে তাঁকে বাজারচলতি ছবি বানাতে হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' বানাবেন এই ইচ্ছা সব সময় সযত্নে লালন করেছেন তিনি। যখন নিজে চলচ্চিত্র প্রযোজনা করার পর্যায়ে এলেন, তখন বাধা হয়ে দাঁড়ালো দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। তাঁর পরিকল্পিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' ছিলো একটি রাজনৈতিক ছবি, আইয়ুবের স্বৈরাচার আমলে সে ধরনের ছবি বানানো ছিলো একেবারেই অসম্ভব। এজন্যই তিনি প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের উর্মিমুখর দিনগুলোতে বানিয়েছিলেন 'জীবন থেকে নেয়া।' এ ছবিতে একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রভাত ফেরী এবং আন্দোলনের দৃশ্যে জহির রায়হানের রাজনৈতিক আবেগের যে তীব্র প্রকাশ ঘটেছে, বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না ভাষা আন্দোলনের শেকড় তাঁর চেতনার কত গভীরে প্রোথিত। এরপর আরো বড় ক্যানভাসে সর্বজাতির সর্বকালের আবেদন তুলে ধরতে চেয়েছিলেন 'লেট দেয়ার বি লাইট'–এ, যে ছবি তিনি শেষ করতে পারেননি। এর কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে স্বল্পদৈর্ঘ ছবি 'স্টপ জেনোসাইড'–এ। তবু 'একুশে ফেব্রুয়ারী নির্মাণের পরিকল্পনা তিনি বাতিল করেননি। '৭২-এর দুর্ঘটনায় এভাবে হারিয়ে না গেলে হয়তো স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি বানাতেন তাঁর সেই স্বপ্ন আর আবেগের ছবি।

২

বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে জহির রায়হানের অংশগ্রহণ কোন আকস্মিক বা নিছক আবেগতাড়িত ঘটনা ছিলো না। তাঁর রাজনৈতিক জীবন–প্রবাহের স্বাভাবিক গতি তাঁকে যুক্ত

করেছিলো এই আন্দোলনের সঙ্গে। যে কারণে শুধু বায়ান্নতে নয়, উনসত্তর বা একাত্তরেও তাঁকে খোলাখুলি আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়াতে হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক লেখক শিল্পীদের ভেতর তিনি ছিলেন রাজনীতির প্রতি সবচেয়ে বেশি অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাঁকে যাঁরা জানেন তাঁরা সবাই স্বীকার করবেন, তিনি সব সময় খোলাখুলি তাঁর রাজনৈতিক মত ব্যক্ত করতেন। এর জন্য তাঁকে যথেষ্ট নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়েছে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এই রাজনীতির জন্যই তাঁকে অকালে হারিয়ে যেতে হয়েছে।

চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি জহির রায়হান যখন স্কুলের নীচের ক্লাশের ছাত্র, তখন অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রভাবে তিনি রাজনীতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। শহীদুল্লাহ কায়সার তখন কোলকাতার একজন ছাত্রনেতা। প্রকাশ্যে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে এবং গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। জহির রায়হান তখন পার্টি-কুরিয়ার ছিলেন। পার্টির আত্মগোপনকারী সদস্যদের মধ্যে চিঠিপত্র ও খবর আদান প্রদানের কাজ করতেন। প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'স্বাধীনতা' বিক্রি করতেন। তখনকার দিনে পার্টি কর্মীরাই পার্টির কাগজ বিক্রি করতেন। সেই আমলের একজন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জহির রায়হান সম্পর্কে বলেছেন, 'তখন ও ভালোভাবে হাফপ্যান্টও পরতে জানতো না। প্রায় বোতাম থাকতো না বলে একহাতে ঢোলা হাফপ্যান্ট কোমরের সাথে ধরে রাখতো। রায়হান ছিল ওর 'টেকনেম'—পার্টি পরিচয়ের ছদ্মনাম (তার পিতৃদত্ত নাম জহিরউল্লাহ)। বড়ভাইর প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলো।' জহির রায়হানের পার্টি জীবনের সূচনা সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানতে পারিনি।

বায়ান্ন সালে ভাষা আন্দোলনের সময় শহীদুল্লাহ কায়সার আত্মগোপন অবস্থায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ছিলেন। জহির রায়হান জানতেন পার্টির নির্দেশ হচ্ছে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার। তিনি পরে বলেছেন, 'ছাত্রদের মিটিঙেও সিদ্ধান্ত হলো ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে। ছাত্রদের গ্রুপে ভাগ করা হলো। আমি ছিলাম প্রথম দশজনের ভেতর। প্রথম দিকে যাঁরা ১৪৪ ধারা ভেঙেছে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে ট্রাকে চাপিয়ে সোজা লালবাগে নিয়ে গেছে। পরে ছাত্রদের মনোভাব দেখে পুলিশ গুলি চালিয়েছিলো।' জহির রায়হান কেন প্রথম দশজনের ভেতর ছিলেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি স্বভাবসুলভ স্মিত হেসে বহুবার পরিবারের সদস্যদের কাছে গল্প করেছেন, 'সিদ্ধান্ত তো নেয়া হলো ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে। কিন্তু প্রথম ব্যাচে কারা যাবে? হাত তুলতে বলা হলো। অনেক ছাত্র থাকা সত্ত্বেও হাত আর ওঠে না। কারণ ক্যাম্পাসের বাইরে পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে পজিশন নিয়ে বসে আছে। ভাবখানা এই যে, বেরুলেই গুলি করবে। ধীরে ধীরে একটা দু'টো করে হাত উঠাতে লাগলো। গুনে দেখা গেলো আটখানা। আমার পাশে ছিলো ঢাকা কলেজের একটি ছেলে। আমার খুব বাধ্য ছিলো। যা বলতাম, তাই করতো। আমি হাত তুলে ওকে বললাম হাত তোল। আমি নিজেই ওর হাত তুলে দিলাম। এইভাবে দশজন হলো।'

জহির রায়হান পরবর্তী সময়ে সরাসরি পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। শহীদুল্লাহ কায়সার যদিও তখন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। জহির রায়হানের সেই সময়ের লেখা কিছুটা রোমান্টিক ও আবেগ বহুল হলেও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম তিনি তখনকার গল্প ও উপন্যাসে যথেষ্ট দক্ষতা ও দরদের সঙ্গে এঁকেছেন। প্রথম ছবি 'কখনো আসেনি' এবং দ্বিতীয় ছবি 'কাঁচের দেয়াল'-এর শহরের নিম্নবিত্ত জীবনের দারিদ্র, বেকারত্ব, ব্যবসায়ীদের ধূর্ততা, দুর্নীতি ও বৈষম্যের চিত্র রয়েছে।

১৯৬৬ সালে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টির মতাদর্শগত বিরোধের ফলে অপরাপর দেশের মতো এখানকার কমিউনিস্ট পার্টিও দ্বিধাবিভক্ত হয়। শহীদুল্লাহ কায়সারের অবস্থান ছিলো মস্কোপন্থী শিবিরে। জহির রায়হান ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। পার্টি ভাঙার জন্য সরাসরি পার্টির নেতৃস্থানীয় লোকজনদের সমালোচনা করতেন। তাঁর বড় বোন নাফিসা কবির পার্টির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না থাকলেও চীনের লাইন সমর্থন করতেন এবং বড়দা শহীদুল্লাহ কায়সারের

সঙ্গে কখনো তর্কও করতেন। নাফিসা কবির অবশ্য এই সময়ে বিদেশে থাকতেন, কখনো দেশে এলে পার্টির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনা করতেন। এই সময় নাফিসা কবির জহির রায়হানকে রাজনৈতিকভাবে কিছুটা প্রভাবিত করেছিলেন।

'৬৯ এর অভ্যুত্থানের সময় জহির রায়হান রাজনীতির প্রতি অধিকতর আগ্রহী হলেন এবং এই সময় তিনি পিকিংপন্থী রাজনীতির প্রতি বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়েন। লৌহমানব হিসেবে কথিত আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরাচারের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি রুপকের আশ্রয় নিয়ে 'জীবন থেকে নেয়া' নির্মাণ করেন। 'জীবন থেকে নেয়া'য় যথেষ্ট ভাবাবেগ ও মেলোড্রামা থাকলেও জহির রায়হানের ছবিতে এই প্রথমবার রাজনৈতিক বক্তব্য জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়। '৬৯ এর গণ-আন্দোলনের কিছু প্রামাণ্য দৃশ্য তিনি এই ছবিতে সংযোজন করেছেন। এই দৃশ্যগুলি তোলার জন্য দিনের পর দিন তিনি ক্যামেরা এবং দু-তিন জন সহকারী নিয়ে মিছিলে মিছিলে ঘুরেছেন। এই ছবিতে সংযোজন ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রভাত ফেরীর প্রামাণ্য দৃশ্যটি তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট দুঃসাহসিকতা পূর্ণ কাজ ছিলো। ছাড়পত্র পেতে এই ছবিকে কি রকম ঝুঁকি পোহাতে হয়েছিলো এ কথা সবার জানা আছে। সেন্সরবোর্ডের বাধা পেয়ে জহির রায়হান এই ছবি নিয়ে হৈ চৈ করতে চেয়েছিলেন। যে জন্যে তিনি তখনকার বামপন্থী ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও কয়েকজন প্রতিবাদী সাংবাদিককে এ ছবি দেখিয়েছিলেন সেন্সরের ছাড়পত্র পাওয়ার আগে, যাতে তাঁরা এ নিয়ে আন্দোলন বা লেখালেখি করতে পারেন। দেশের তৎকালীন বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সরকারী কর্তৃপক্ষ কিছু দৃশ্য কেটে রেখে ছবিটি মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলো।

'৭০ সালে জহির রায়হান 'এক্সপ্রেস' পত্রিকা বের করেন এবং এর যাবতীয় খরচ তিনি একাই বহন করতেন। পত্রিকা অবশ্য আগেও অনেক বের করেছেন তিনি। পঞ্চাশ দশকে 'প্রবাহ', 'অনন্যা' প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। তবে 'এক্সপ্রেস' ছিলো রাজনীতি সচেতন পত্রিকা। প্রথম দিকে কিছুটা রম্য চরিত্র থাকলেও কয়েক সংখ্যা পরই রাজনৈতিক বক্তব্য জোরালোভাবে উপস্থিত হয়। এই সময় তিনি প্রথমবারের মতো মাও সেতুঙের রচনা পাঠ করেন এবং এর দ্বারা দারুণ রকম প্রভাবিত হন। তখন এখানে মাও সেতুঙের চিন্তাধারার অনুসারী কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি একাধিক দল উপদলে বিভক্ত ছিলো। এদের প্রায় সবার সঙ্গে জহির রায়হান যোগাযোগ রাখতেন, পার্টি ফান্ডে মোটা অংকের চাঁদাও দিতেন। '৭১ এর ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি তাঁর মরিস অক্সফোর্ড গাড়িটিও একটি সংগঠনকে সর্বক্ষণ ব্যবহারের জন্যে দিয়েছিলেন। পিকিংপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও জহির রায়হান মস্কোপন্থীদের অনুষ্ঠানাদিতে সময় পেলে যোগ দিতেন। তিনি তাঁর নির্মীয়মান ছবি 'লেট দেয়ার বি লাইট' মস্কো প্রেরণ করার কথাও বলতেন। শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রভাব তাঁর উপর এত বেশি ছিলো যে, তাঁর সামনে তিনি সবসময় মস্কোপন্থীদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকতেন। তাছাড়া মস্কোপন্থী অনেক লেখক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এমন পর্যায়ে ছিলো যে, নিজে মাও সেতুঙের চিন্তাধারার অনুসারী হয়েও তিনি এদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। তিনি পিকিংপন্থীদের ঐক্য মনে প্রাণে কামনা করতেন।

'৭১ এর ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা এদেশে যে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ করে জহির রায়হান এতে এত বেশি বিচলিত বোধ করেন যে, রাতের পর রাত তিনি অস্থির ও নির্ঘুম অবস্থায় কাটিয়েছেন। মাও সেতুঙের সামরিক প্রবন্ধাবলীর দারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তখন দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের কথা ভাবতেন। পার্টির কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে তিনি যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্যই ঢাকা ছেড়ে আগরতলা এবং পরে কোলকাতা চলে যান। কোলকাতায় তিনি প্রচার কাজ সংগঠিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকারের রোষানলে পতিত হন এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে নিগৃহিত হতে হয়। কোলকাতায়

নয় মাস তাঁকে দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয়েছে। 'স্টপ জেনোসাইড' ছবিটি নির্মাণের সময় আওয়ামী লীগের নেতারা তাকে নানাভাবে বাধা দিয়েছে। বিভিন্ন সেকটরে সুটিং করতে দেয়নি, এমন কি কোন কোন সেকটরে তাঁর গমন পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিলো। অবশেষে সাত নম্বর সেকটরে তিনি সুটিং এর সুযোগ পেলেন এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাজেট ও সময়ে এই অপূর্ব ছবিটির নির্মাণ কাজ শেষ করলেন। আওয়ামী লীগ নেতারা ছবি দেখে ছাড়পত্র না দেয়ার জন্যে পশ্চিমবঙ্গের সেন্সর বোর্ডকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। একজন জাঁদরেল আওয়ামী লীগ নেতা এই বলে হুমকিও দিয়েছিলেন যে, এই ছবিকে ছাড়পত্র দেয়া হলে তিনি বাংলাদেশ মিশনের সামনে অনশন করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সেন্সর কর্তৃপক্ষ এ ছবিকে ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করায় জহির রায়হানকে দিল্লী পর্যন্ত দৌড়াতে হয়। শহীদুল্লাহ কায়সারের কয়েকজন পুরোনো সহকর্মী ও বন্ধু যারা ভারতীয় সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন তাঁদের তদবিরে বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর এ ছবিকে ছাড়পত্র দেয়া হলেও জনসমক্ষে এ ছবি প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা জহির রায়হান করতে পারেননি।

'স্টপ জেনোসাইড'—এর প্রতি মুজিব নগর সরকারের কিছু নেতা এই কারণেই কুপিত ছিলো যে, এ ছবি শুরু হয়েছে লেনিনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, আর শেষ হয়েছে আন্তর্জাতিক (জাগো জাগো সর্বহারা) এর সুর বাজিয়ে। তাছাড়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একটি অংশ তখনও আমেরিকার সাহায্য ও সমর্থন পেতে উন্মুখ ছিলো অথচ এ ছবিতে সরাসরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য উথাপন করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতারা বাধা দিলেও জহির রায়হানের মস্কোপন্থী ভারতীয় বন্ধুরা এ ছবি মুক্তির ব্যাপারে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করায়, তিনি সেই সময় মস্কোপন্থী ভারতীয় বন্ধুদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। সেই সময়টা ছিলো জহির রায়হানের রাজনৈতিক বিভ্রান্তির কাল। কারণ তিনি চীনের তখনকার ভূমিকাকে সমর্থন করেননি এবং প্রায় সর্বদাই মস্কোপন্থীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। তবু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও জহির রায়হান কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নকশাল নেতার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন এবং অসীম চ্যাটার্জীর সঙ্গে আলোচনাকালে চারু মজুমদারের বিরুদ্ধে বিরূপ ও অশোভন মন্তব্য করার জন্যে তিনি অসীম বাবুর উপর বিরক্তও হয়েছিলেন।

'৭১ সালের শেষের দিকে জহির রায়হানের কার্যকলাপকে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিও সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিলো। কোলকাতার মস্কোপন্থী বুদ্ধিজীবীরা জহির রায়হানের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও মস্কোপন্থী পার্টির সঙ্গে জহির রায়হানের কোন যোগাযোগ ছিল না। অক্টোবর মাসে লণ্ডনে অবস্থিত বাংলাদেশ বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য জহির রায়হানকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং রিটার্ণ টিকিটও পাঠানো হয়। জহির রায়হানের প্রথমেই বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় ট্রাভেল পারমিট সংগ্রহ করতে গিয়ে। এরপর সমস্যা দেখা দেয় মস্কোর ভিসা পেতে। জহির রায়হানের অনুরোধে লণ্ডনের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা (ঢাকা যাদুঘরের অধ্যক্ষ এনামুল হক ছিলেন আমন্ত্রণকারী) তাঁকে লণ্ডন যাওয়ার পথে মস্কো হয়ে যাবার টিকিট পাঠিয়েছিলেন। মস্কো দেখার সখ ছিলো জহির রায়হানের অনেক দিনের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিল্লী গিয়েও তিনি মস্কোর ভিসা সংগ্রহ করতে পারেননি এবং এরই জন্য তখন তাঁর লণ্ডন যাওয়া হয়নি। জহির রায়হানের প্রতি সোভিয়েত দূতাবাসের এহেন আচরণে তাঁর মস্কোপন্থী ভারতীয় বন্ধুরা বিস্মিত হলেও যেহেতু তিনি মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সুনজরে ছিলেন না, সে জন্য এই নাজুক পরিস্থিতিতে, মস্কোতে তাদের প্রতি অবিশ্বস্ত জহির রায়হানের উপস্থিতি সোভিয়েত দূতাবাসের কাম্য ছিলো না। মস্কোর ভিসা না পেয়ে জহির রায়হান সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের প্রতি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

'৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর শহীদুল্লাহ কায়সারের মৃত্যুর সংবাদ শুনে জহির রায়হান একবারেই ভেঙ্গে পড়েন। ১৭ তারিখে ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক হেলিকপ্টারে করে ঢাকা এসে আলবদরের মরণ কামড়ের খবর বিস্তারিত জানতে পারলেন। বিভিন্ন জায়গায় ছুটোছুটি করে হানাদার বাহিনীর সহযোগী বহু চাঁই ব্যক্তির নাম সংগ্রহ করলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, তিনি শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন। তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকেও দায়ী করেন। তিনি তখন মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। জামাতে ইসলামীর ঘাতক বাহিনী আলবদরদের দ্বারা ধৃত শহীদুল্লাহ কায়সারকে খোঁজার জন্য পীর-ফকিরেরও শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি। এমন এক জনের খপ্পরে পড়ে তিনি আজমীর পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

'৭২ এর ৩০ জানুয়ারী মিরপুরে তার অগ্রজকে খুঁজতে গিয়েছিলেন সে স্থানটি তখনও ছিলো পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কিছু লোক ও তাদের সহযোগীদের নিয়ন্ত্রণে। তদন্ত করলে হয়তো জানা যেতো সেই অজ্ঞাত টেলিফোন কোত্থেকে এসেছিলো, যেখানে তাঁকে বলা হয়েছিলো শহীদুল্লাহ কায়সার মিরপুরে আছেন কিংবা মিরপুর থেকে কিভাবে তিনি উধাও হলেন। এটাও বিস্ময় যে, তার অন্তর্ধান সম্পর্কে কোন তদন্ত হয়নি। একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে তাঁর বিশ্বাসই তাঁকে এভাবে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

জহির রায়হান মার্কসীয় দর্শনের অনুসারী হলেও বড়দার মৃত্যু সংবাদে তিনি অদৃষ্টবাদী হয়ে গিয়েছিলেন। এর একটা কারণ এও হতে পারে যে, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন প্রমুখের মূল রচনাবলী তিনি সামান্যই পড়েছেন। কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভ্রান্তি, নেতৃত্বের দেউলিয়াপনা ও বিভক্তিতে তিনি বিক্ষুব্ধ হতেন, কখনো বা হতাশ হয়ে পড়তেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মস্কো–পিকিং বিভক্তির পর তিনি পিকিংপন্থী শিবিরে অবস্থান করেও পরবর্তীকালে পিকিংপন্থীদের বিভক্তির সময় কোন বিশেষ দলের পক্ষ নেননি। তাঁর লেখা ও ছবিতে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস পুরোপুরি প্রতিফলিত না হলেও কিছু লেখা ও ছবি থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় জহির রায়হান কোন শিবিরের লোক— প্রগতির না প্রতিক্রিয়ার। নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রগতির শিবিরেই তার অবস্থান এবং এই শিবিরে অবস্থানের কারণেই প্রতিক্রিয়ার নির্মম শিকার হয়েছিলেন তিনি।

৩.

বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশ অমান্য করে ছাত্ররা একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙ্গে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আগেই বলেছি যে দশজন ছাত্র প্রথম মিছিল করে বেরোয় জহির রায়হান ছিলেন তাঁদের একজন। প্রথম দিকের কয়েকটি দলকে গ্রেফতার করে ট্রাকে তুলে লালবাগের কেল্লার পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর গুলি চালানো হয়।

এই ঘটনাটি জহির রায়হানের 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র কাহিনীতেও বিধৃত হয়েছে। এই কাহিনীর ছাত্র নায়ক তসলিম একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙ্গার জন্য বক্তৃতা দেয়। মিছিলে গুলি খেয়ে লাশ হয়ে হাসপাতালে যায়।

'৭১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে একটি সংকলনের জন্য আমি জহির রায়হানের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু— যাঁরা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের এবং অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের কাছ থেকে লেখা নিয়েছিলাম। প্রত্যেকটি লেখার বিষয়বস্তু ছিলো এক— বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী দিনটিকে তাঁরা কে কিভাবে দেখেছেন। জহির রায়হানের পর্যবেক্ষণের কাছাকাছি দুটি লেখার অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি যা কিনা তাঁর এই কাহিনীর প্রামাণ্যভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এর একটি অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের অপরটি ঢাকা কলেজে তাঁর সহপাঠী বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের।

শহীদুল্লাহ কায়সার লিখেছেন—

'একুশে ফেব্রুয়ারী। ১৯৫২। উনিশ বছর পর একটি বিক্ষুব্ধ দিনের সব ক'টি মুহূর্তের উত্তেজনা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, রোমাঞ্চ বেদনা স্মরণ করা দুরূহ। অনেক মুখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। অনেক মুখ ঝকঝকে ছবির মত এখনও ভাসছে চোখের সামনে যা আর কোনদিন দেখা যাবে না। অনেক ঘটনা যা সেদিন মুখ্য মনে হয়েছিল আজ গৌণ হয়ে এসেছে। সেদিন যা দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল অভিজ্ঞতার আলোকে আজ তা স্পষ্ট।

'দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আজ নতুন চেতনা এসেছে। এসেছে অনেক তীব্রতা। গণসংস্থাগুলো অনেক বেশি সজাগ। তাই আজকের কোন আন্দোলনের সাথে বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারীকে তুলনা করা অনুচিত।

'যে এলাকায় একুশের ঘটনা প্রবাহের সূচনা হয় তা আজ চেনা দুষ্কর। সেখানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজকের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট হাসপাতালটা ছিল সেদিনের কলাভবন। যেখানে মেডিকেল হাসপাতালে আউটডোর এবং নার্সের কোয়ার্টার সেখানে ছিল কতগুলো ব্যারাক। তলার দিকে হাত চারেক পর্যন্ত ছিল পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথনী, উপরটা কঞ্চির বেড়া। শীতের দিনে কুয়াশা এবং শীত হুড়হুড় করে ভেতরে ঢুকে বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়তো। এটাই ছিল মেডিকেল ছাত্রাবাস। এখানেই গুলি চলছিলো, যার একাংশকে নিয়ে আজকের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।

অনুজ শাহরিয়ার সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে লিখতে বলেছেন। কিন্তু তা লেখা সম্ভব নয়, কেননা এত কিছু লেখার আছে এবং এত কিছু স্মৃতি থেকে খুঁচিয়ে তোলার রয়েছে যা স্বল্প সময়ে সম্ভব নয়। আর এটা এমন একটা দিন এবং এমন একটা বিষয় যা নিয়ে ভাসা ভাসা বা আংশিকভাবে কলম চালান উচিত নয়।

'আগেই বলেছি আজ ওই এলাকাটার পরিবর্তন হয়েছে, আজকের আন্দোলনের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু যে পরিবেশে সেদিনের সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তার পরিবর্তন এখনও, উনিশ বছর পরও দেখছি না। সেটা হল শাসককুলের স্বৈরাচারী মনোভাব।

'একুশের হরতাল ও জমায়েতকে পণ্ড করার জন্য ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যারাত্রিতে যখন ১৪৪ ধারা জারি করা হল তখনও কেউ বুঝতে পারেনি পরদিন অর্থাৎ ২১ তারিখে কি ঘটবে ? কিন্তু মধ্যরাত্রির মধ্যেই অবস্থাটা পাল্টে গেল। মধ্যরাত্রির মধ্যেই ফজলুল হক হল, ঢাকা হল ও সলিমুল্লা হলের ছাত্ররা মিটিং করে জানিয়ে দিলেন যে তারা পিছ পা হতে রাজী নন। যদি সরকার ভয় দেখিয়ে রক্তচক্ষুর শাসানি ভাষায় রূপান্তরিত করতে চায় তবে এখনই তার ফয়সালা হয়ে যাক। এ মনোভাব এবং সিদ্ধান্ত গোটা আন্দোলনের চেহারাটা পাল্টিয়ে দেয়। তাই আমরা দেখি শুধু পুলিশ নয় মুসলিম লীগের পালা গুণ্ডারা, মহল্লার সর্দাররা স্কুলে স্কুলে ভয় দেখিয়ে বেড়ানো সত্ত্বেও একুশে ফেব্রুয়ারী সব স্কুল কলেজে ধর্মঘট হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

'মেডিকেল কলেজ ছাত্রসংসদ এবং মেডিকেল ছাত্রাবাস ছিল সেদিনের একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সারা পাকিস্তানে ঢাকা মেডিকেল কলেজই একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল যেখানে মুসলীম ছাত্রলীগ নামে প্রতিষ্ঠানে কোন কমিটি এমন কি একজন সভ্যও ছিল না। সংগ্রাম কমিটির প্রাণশক্তি ছিল মেডিকেলের ছাত্রসংসদ। সম্ভবতঃ এ কারণেই মেডিকেল ছাত্ররা পুলিশের বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্য ছিল।

'গুলি চালনার ধরনটাও লক্ষণীয়। প্রথম কয়েক রাউণ্ডের গুলি মেডিকেল ছাত্রাবাসকে লক্ষ্য করেই চালান হয়। এগার নম্বর, তিন নম্বর, এবং সাত নম্বর ব্যারাকের ঘরের ভেতরে পাঁচ ইঞ্চি দেয়ালে ছেদ করে পড়ার টেবিলে, শোয়ার খাটিয়ার গিয়ে বুলেট বিদ্ধ হয়। প্রথম রাউণ্ডের গুলিতেই বরকত শহীদ হন। এখানে যারা যারা আহত হন তাদের সবগুলো আঘাতই হাঁটুর উপর। মারার জন্যই যে সেদিন গুলি ছোঁড়া হয়েছিল এবং ছাত্রাবাসে এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়া হয়েছিল তাতে লেশ মাত্র সন্দেহ নেই।'

(সচিত্র সন্ধানী ঃ একুশে ক্রোড়পত্র ফেব্রুয়ারী ১৯৭১)

জহির রায়হানের সহপাঠী, তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র বোরাহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনটি সম্পর্কে লিখছেন—

'বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ভিড় ; বাইরে ১৪৪ ধারা ; সকাল দশটা। চিৎকার শ্লোগান। বাইরে পুলিশ। আমরা ঘুরছি, কথা শুনছি ; সবাই উত্তেজিত, সবকিছুই অনিশ্চিত, মধ্যে মধ্যে শ্লোগান ; রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আমরা ঘুরছি, কথা শুনছি, নেতারা ব্যস্ত, পরস্পরের উপর ক্রুদ্ধ, মধ্যে মধ্যে শ্লোগান ; পুলিশ জুলুম চলবে না। ভিড় বাড়ছে ভিতরে আর রাস্তা ফাঁকা, পুলিশ বাদে।

'হোস্টেলে থাকি, ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশের ছাত্র। আমরা ক'জন হাজির। কেন এসেছি স্পষ্ট। স্বপ্নের মধ্যে মার মুখ, তার একটি শব্দ ; বাংলা ; আমার মনে এছাড়া আর কিছু নেই। ভিড় ; চিৎকার শ্লোগান, সকাল সাড়ে দশটা।

'হঠাৎ দেখি কারা যেন লোহার গেট খুলে দিয়েছে, আর সবাই দুজন দুজন করে রাস্তায়। পুলিশ তৎপর, গ্রেফতার করছে, খোলা গাড়িতে তুলছে, আর শ্লোগান। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই; পুলিশ জুলুম চলবে না। শ্লোগান তো নয় শব্দের প্রতিবাদ।

'আমি আমগাছতলায়, চোখ ঐ সব। আকাশ নির্মম নীল। শব্দ পাগল করে দিচ্ছে পুলিশদের, বেড়ির মতো বাংলাভাষা তাদের ঘিরে ধরেছে, সেই তখন টিয়ারগ্যাস ছুঁড়তে শুরু করেছে তারা। টিয়ারগ্যাস ফাটছে, ধোঁয়ায় একাকার, অসহ্য যন্ত্রণা চোখে মুখে ; আমরা ছুটে দোতলায়, সকাল এগারোটা। আধঘন্টা বাদে নিচে এলাম। পিছনের লোহার রেলিং ডিঙ্গিয়ে সড়ক বেয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। খিদেও পেয়েছে। এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ালাম অনেকক্ষণ। পুরানা পল্টনের পুলের কাছে এক রেস্টুরেন্ট, চা আর খাবার খেলাম। যখন বেরোলাম রাস্তা থমথম করছে। কি ব্যাপার ? পুলিশ গুলি চালিয়েছে মেডিকেল কলেজের সামনে। কয়েকজন মারা গেছেন। স্বপ্নের মধ্যে মার মুখের মতো চারপাশে বাংলাদেশ, বাংলাভাষা আর বাংলাকে গুলি করছে কারা কারা—সমস্ত চেতনায় থরথর ঐ প্রশ্ন।

'পিছনের গেট দিয়ে মেডিকেল কলেজে এলাম। রাস্তার ধারেই ছাত্রাবাস, সেখানে জটলা চিৎকার, শ্লোগান, ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি। বিকেল চারটায়, দৈনিক আজাদের বিশেষ সংখ্যা, কাড়াকাড়ি করে নিলাম। কারা যেন বলল, জেলে কি আজাদ পাঠানো সম্ভব ? বন্ধুদের জানান উচিত নয় কি ঘটছে বাইরে ?'

'আমরা ঠিক করলাম পৌছে দেব। জেলখানার পশ্চিম দিকে উর্দু রোড, মসজিদের উল্টোদিকেই জেলখানার প্রাচীর। মসজিদের মিনারে চড়ে আজাদ ছুড়ে দেয়া হল। জেলখানার মাঠে রাজবন্দীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা দৌড়ে এসে কুড়িয়ে নিলেন।

'শুনলাম সান্ধ্য আইন জারী হয়েছে। বেচারাম দেউড়ীতে ছাত্রাবাস, যখন পৌছোলাম সান্ধ্য আইনের শুরু। পুলিশের গাড়ী রাস্তায়। কিছু একটা করা দরকার। ছাদে আমরা ঃ রাত্রি বিদীর্ণ করে শ্লোগান উঠছে নানাদিক থেকে। বেচারাম দেউড়ীতে ঢাকা কলেজের তিনটি ছাত্রাবাস, সেইসব ছাদ থেকে আওয়াজ উঠছে, মিলছে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ছাত্রাবাসে, মিলেছে গিয়ে সারা বাংলাদেশে। কোথাও থেকে গুলির শব্দ আসছে। রেডিওতে নূরুল আমীনের গলা। ঘৃণা ঘৃণা ঘৃণা !

'ঘুমতো নয় আশা ও হতাশার নির্যাতন।' (প্রাগুক্ত)

জহির রায়হানের ঘনিষ্ঠ দুজন, একজন তার অগ্রজ, আরেকজন সহপাঠী— ঠিক এভাবেই বর্ণনা করেছেন বায়ান্ন সালের সেই আগুন-ঝরা দিনটির কথা। তাঁর অন্য বন্ধুরাও— যাঁরা তাঁর কাছাকাছি ছিলেন, প্রায় একইভাবে দেখেছেন এই দিনটিকে। সেদিন যাঁরা ছাত্র ছিলেন অথবা ক্যাম্পাসে ছিলেন, প্রত্যেকের পর্যবেক্ষণই একই ধরনের ছিলো। জহির রায়হানের পর্যবেক্ষণ যে এর চেয়ে আলাদা কিছু ছিলো না— তাঁর 'আরেক ফাল্গুন' বা 'একুশে ফেব্রুয়ারী' পড়লে পরিষ্কার বোঝা যাবে।

১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি জহির রায়হান 'একুশে ফেব্রুয়ারী' ছবিটি বানাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি 'আরেক ফাল্গুন' যদিও এর আগে লিখেছিলেন, কিন্তু ছবির জন্য ভেবেছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা কাহিনী। শিল্পী মুর্তজা বশীরকে তিনি চিত্রনাট্য লেখার দায়িত্ব দিয়ে বলেছিলেন, গল্পের কাঠামো হবে এই রকম— চারটি পরিবার সমাজের চারটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করবে। একটি উচ্চবিত্ত, একটি মধ্যবিত্ত, একটি শ্রমিক ও একটি কৃষক দম্পতি থাকবে, যারা ঘটনাক্রমে বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনটিতে এমন একটি জায়গায় একত্রিত হবে যেখানে ছাত্রদের মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে। গুলির শব্দ হওয়ার পরই দেখা যাবে একটি কাক আর্ত কণ্ঠে উড়ছে গোটা ঢাকা শহরের আকাশে।

মুর্তজা বশীর জহির রায়হানের মুখে বলা গল্পটির উপর ভিত্তি করে 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র চিত্রনাট্য লেখেন। শ্রমিক চরিত্রটির মুখে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করার জন্য বস্তিতে ঘুরে শব্দচয়ন করেন। চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ হলে জহির রায়হান এটি এফডিসি স্টুডিওতে জমা দেন। নবারুণ ফিল্মস-এর ব্যানারে নির্মিতব্য এই ছবির জন্য চরিত্র নির্বাচন পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিলো। এ ছবিতে অভিনয় করার কথা ছিলো খান আতা, সুমিতা, রহমান, শবনম, আনোয়ার, সুচন্দা, কবরী প্রমুখ চিত্র তারকার। কিন্তু এ ছবি নির্মাণের অনুমতি তাঁকে দেয়া হয়নি। মুর্তজা বশীর আমাকে পরে বলেছেন একুশে ফেব্রুয়ারীর চিত্রনাট্য লেখার জন্য জহির রায়হান তাঁকে অগ্রিম একশ টাকাও দিয়েছিলেন। তাঁর মতে এফডিসিতে খুঁজলে এই চিত্রনাট্যটি পাওয়া যাবে।

এরপর জহির রায়হান বাণিজ্যিক ছবি বানাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 'একুশে ফেব্রুয়ারী' বানাবার সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকে। পাঁচ বছর পর জহির রায়হানের 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র চিত্রকাহিনী প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক 'সমীপেষু'তে। আমি তখন সাহিত্য-চলচ্চিত্র বিষয়ক এই পত্রিকাটির সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলাম। একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা বেরুবে। জহির রায়হানকে অনুরোধ করলাম একটি উপন্যাস লিখতে বিশেষভাবে বললাম 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামে যে ছবিটি তিনি করার কথা ভেবেছিলেন তার কাহিনীটি দেয়ার জন্য। তিনি জানালেন, চিত্রনাট্যটি হারিয়ে গেছে। পরে তাঁকে বললাম, 'লেট দেয়ার বি লাইট' নামে যে ছবিটি বানাবার কথা ভাবছেন তার কাহিনীটি দিতে। তিনি রাজী হলেন। ক'দিন পর হঠাৎ শুনলাম, সচিত্র সন্ধানীর (তখন মাসিক এবং আমাদের পত্রিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী) সম্পাদক গাজী শাহাবুদ্দীন, যিনি কিনা জহির রায়হানের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন— তাঁর অনুরোধ ফেলতে না পেরে 'লেট দেয়ার বি লাইট'-এর কাহিনীটি 'আর কত দিন' নামে তাঁকে সন্ধানীর জন্য দিয়ে ফেলেছেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই আমি ক্ষুব্ধ হই এবং জহির রায়হানও আমার আচরণে বিব্রত হন। শেষে তিনি সম্মত হন, আমাদের পত্রিকার জন্য 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র কাহিনীটি দেবেন, তবে শর্ত হচ্ছে তিনি বলে যাবেন, আমি শুনে শুনে লিখবো।

জহির রায়হানের ক্ষেত্রে এটি নতুন বা অভিনব কিছু নয়। আমি যখন তাঁর সহকারী হিসেবে ছবিতে কাজ করছি তখন দেখেছি তিনি বলে যাচ্ছেন আর তাঁর দু'জন সহকারী এক সঙ্গে দু'টি ছবির চিত্রনাট্য শ্রুতিলিখনে ব্যস্ত।

কখনো তিনি টেপরেকর্ডারে বলে গেছেন, সহকারীরা সেখান থেকে পাঠোদ্ধার করেছেন। তবে তখন আমার এটা মনে হয়েছিলো— এভাবে বাজারচলতি ছবির চিত্রনাট্য হয়তো লেখা যেতে পারে, কিন্তু সৃজনশীল সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। ফলে শ্রুতিলিখনের দ্বারা 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র কাহিনী লেখার ব্যাপারে আমি খুব একটা আশাবাদী ছিলাম না। দেখা গেলো এ ছাড়া উপায়ও নেই। তিনি ছবির স্যুটিং নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত।

তখন সম্ভবত ঈদের জন্য কয়েকদিন ছুটি ছিলো। আমি পর পর তিনদিন বসে জহির রায়হানের কথামতো লিখে গেলাম। শ্রুতিলিখনের জন্য তিনদিন অনেক বেশি সময়, তবু লেখার ফাঁকে ফাঁকে চিত্রনাট্যের মত ছবির দৃশ্যগুরো বিস্তারিত শুনতে চাইতাম বলে লিখতে গিয়ে সময় বেশি লাগলো। এই শুনতে চাওয়াটাও অস্বাভাবিক ছিলো না। কারণ জহির রায়হানের অধিকাংশ চিত্রনাট্য খসড়ার মতো লেখা। ছবির শট বিভাজনের সময় এমনকি স্যুটিং-এর সময়ও অনেক নতুন উপাদান যোগ হতো। যে কারণে তাঁর চিত্রনাট্য পড়ে বোঝা যাবে না শেষ পর্যন্ত ছবিটি কি হবে। শুধু একবার এর ব্যতিক্রম দেখেছি। সেটা তাঁর বহুল প্রশংসিত 'স্টপ জেনোসাইড'–এর ক্ষেত্রে। মূল পরিকল্পনায় এ ছবি যেমনটি হওয়ার কথা ছিলো বাস্তবে এর এক চতুর্থাংশও রূপায়িত হয়নি। আমার ধারণা বাজেট সমস্যায় আক্রান্ত না হলে এটি 'গ্রানাডা গ্রানাডা মাইন'–এর চেয়ে বেশি আবেদন সৃষ্টিকারী ছবি হতে পারতো। দুর্ভাগ্য ছবিটির মূল চিত্রনাট্য চুরি হয়ে গিয়েছে।

তাঁর সঙ্গে 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র শ্রুতিলিখনের সময় আলোচনা করতে গিয়ে বুঝেছি আইজেনষ্টাইনের 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন' আর 'অক্টোবর' তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিলো। লেখা শেষ করার পর তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম ছবিটি কবে বানাবেন। তাঁর জবাব ছিলো— এখনো সময় হয়নি।

'৬৫ সালে মর্তুজা বশীরকে যে 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র চিত্রনাট্য লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, '৭০–এ সেই কাহিনীতে জহির রায়হান আরো কটি চরিত্র সংযোজন করেছেন। কাকের প্রতীকটি এখানে আছে কিন্তু মুখ্য হচ্ছে কাহিনীর শেষে নদীর প্রতীকটি। ছবি তৈরি হলে এই কাহিনীতে যে আরো বহু প্রতীক ও উপাদান যুক্ত হতো এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে প্রথম ও শেষ দৃশ্যে অনেকগুলো মন্টাজ এফেক্ট–এর কথা তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।

'একুশে ফেব্রুয়ারী' সমীপেষুতে ছাপার সময় শিল্পী হাশেম খানের কিছু স্কেচও অলঙ্করণ হিসেবে ছাপা হয়েছিলো। জহির রায়হান স্কেচগুলো পছন্দ করেছিলেন।

সমীপেষুতে প্রকাশিত লেখাটিতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ছিলো। তাড়াহুড়ো করে ছাপতে গিয়ে কিছু শব্দ ও বাক্য এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলো। সংশোধিত কপিটি আমার কাছে থাকায় গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সংশোধন করেই ছাপা হয়েছে।

৫

শেষের দিকে জহির রায়হানের সব লেখাই ছিলো চিত্রনাট্যের মতো। এমনকি প্রবন্ধেও তিনি ছোট ছোট বাক্যে চিত্রকল্প নির্মাণ করতেন। 'একুশে ফেব্রুয়ারী' তাঁর একেবারে শেষের রচনা। এরপর বড় কোন লেখায় তিনি হাত দেননি। ছোটখাট কিছু স্কেচ জাতীয় লেখা (অধিকাংশই একুশের স্মরণিকাসমূহের সম্পাদকদের তাগিদে) এবং কয়েকটি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন ৭০–৭১ সালে।

আঙ্গিকগত বিচারে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' 'আর কত দিন'–এর সমশ্রেণীর লেখা এর কোনটাই 'আরেক ফাল্গুন', 'বরফ গলা নদী', বা 'হাজার বছর ধরে'র মতো উপন্যাস নয়। এগুলোকে চিত্রনাট্যের রূপরেখা বা ছবির কাহিনী বলা যেতে পারে। এর ভেতর বহু সংযোজনের অবকাশ আছে। উপন্যাস আকারে লিখতে জহির রায়হান এগুলি অন্যভাবে লিখতেন। আবার ছবি করার সময়ও তিনি আরো বহু কিছু যোগ করতেন। 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিতে একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রভাত ফেরী যারা দেখেছেন তাঁরা জানেন এই ছবির সেরা অংশ এটি। অথচ চিত্রনাট্যে শুধু প্রভাত ফেরীর উল্লেখ ছিলো। ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানের সময় ২১শে ফেব্রুয়ারীর রাত থেকে তিনি শহীদ মিনারে প্রভাত ফেরীর প্রামাণ্য ছবি তুলেছেন। কয়েকটি পরিকল্পিত দৃশের সঙ্গে

অনেকগুলো প্রামাণ্য দৃশ্য সম্পাদনার টেবিলে বসে যোগ করে এর আবেদন বহুগুণ বাড়িয়েছেন। 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র কাহিনীতে মিছিলে গুলির দৃশ্য আছে। 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিতে আমরা মিছিলে গুলির দৃশ্য দেখেছি। শেষোক্ত দৃশ্যের চেয়ে প্রথমটি অনেক বেশি শিল্পমন্ডিত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী।

'একুশে ফেব্রুয়ারী' যদি ছবি হতো তাহলে এটি সরাসরি একটি রাজনৈতিক ছবি হিসেবে আখ্যায়িত হতো। রাজনৈতিক কাহিনীতে কাল একটি বড় বিষয়। রাজনীতি নির্দিষ্ট সময়ের গন্ডীতে এক ধরনের আবেদন সৃষ্টি করে, সময়ের ব্যবধানে সেই আবেদন ফিকে হয়ে যায়, যদি প্রামাণ্যকরণ কাহিনীর প্রধান উপজীব্য হয়। বহু রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত উপন্যাস বা ছবি নির্দিষ্ট সময়ে যতটা আবেদন সম্পন্ন হয় পরবর্তী সময়ে ততোটা নাও হতে পারে। অবশ্য মহৎ শিল্পকর্মের বিষয়টি আলাদা। 'উদয়ের পথে' জাতীয় ছবি এক সময় আদর্শস্থানীয় ছিলো। এখন এর এতটুকু আবেদন আছে বলে মনে হয় না। নিছক সময় বোঝার জন্য বা নির্দিষ্ট সময়ের ছবির চরিত্র বোঝার জন্য এ ধরনের ছবি দেখা যেতে পারে।

'একুশে ফেব্রুয়ারী' বায়ান্ন সালের ঘটনা, মূল কাহিনী লেখা এর এক যুগ পরে। রাজনৈতিক কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও এর চরিত্রগুলি এখনো— এই ছিয়াশি সালেও আধুনিক, মনে হয় সমকালের। আমলা, ব্যবসায়ী, কেরানী, ছাত্র, রিকশাওয়ালা, কৃষক কিম্বা স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, মাতা-পুত্র, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং সর্বোপরি শ্রেণীগত যে সম্পর্ক, সব কিছু এখনকার মতোই ক্রিয়াশীল। কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করলে এ কাহিনী উনসত্তরের কিংবা তিরাশি-চুরাশির অথবা আগামী দিনের কোন আন্দোলনের হতে পারে। শাসকের ভাষা, শোষকের ভাষা এবং আচরণ এতটুকু বদলায়নি। এ কারণেই 'একুশে ফেব্রুয়ারী' মহৎ সৃষ্টির দাবী করতে পারে, এর আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি ধারণা রয়েছে এটি বুঝি নিছক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন। বদরুদ্দিন উমর যদি তিনটি বিশাল খন্ডে ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস (পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি) না লিখতেন আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হতো না সেই সময়কার আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা বা ভাষা আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ মানুষের সমর্থন ও অংশগ্রহণের বিষয়টি। জহির রায়হানের 'একুশে ফেব্রুয়ারী' লেখা হয়েছে এই ইতিহাস রচনার আগে। কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের আবেগ ও অংশগ্রহণের বিষয়টি তাঁর এই লেখায় রয়েছে। যেহেতু এটি মূল চিত্রনাট্য নয়, সেজন্য বিস্তারিতভাবে না এলেও কৃষকের প্রতিনিধি গফুর এবং শ্রমিকের প্রতিনিধি সেলিম কাহিনীর শুরুতে কৌতুহলী বহিরাগত হলেও তাদের পরিণতি ছাত্রদের দ্বারা সূচিত এই আন্দোলনে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করে। এটি সম্ভব হয়েছে জহির রায়হানের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কারণে। একুশে ফেব্রুয়ারী কাহিনী রাজনীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠলেও জহির রায়হানের অপরাপর গল্প উপন্যাসের মতো মানবিক উপাদান ও হার্দিক সম্পর্ক এতে অনুপস্থিত নয়। ফলে রাজনৈতিক হওয়া সত্ত্বেও এটি তত্ত্বগন্ধী বা শ্লোগানক্রান্ত নয়। বর্ণনায় বরং কাব্যিক ব্যঞ্জন রয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কারণ আগেই বলেছি একুশে ফেব্রুয়ারী ছিলো জহির রায়হানের শিল্প-মানসের সৃজনশীল আবেগের অফুরন্ত উৎস।

শাহরিয়ার কবির
১ ফাল্গুন, '১৩৯২

কচুপাতার উপরে টলটল করে ভাসছে কয়েকফোঁটা শিশির।
ভোরের কুয়াশার নিবিড়তার মধ্যে বসে একটা মাছরাঙা পাখি। ঝিমুচ্ছে শীতের ঠাণ্ডায়
একটা ন্যাংটা ছেলে, বগলে একটা স্লেট। আর মাথায় একটা গোল টুপি। গায়ে চাদর।
পায়ে চলা ভেজা পথ ধরে স্কুলে যাচ্ছে।
অনেকগুলো পাখি গাছের ডালে বসে নিজেদের ভাষায় অবিরাম কথা বলে চলেছে।
কতগুলো মেয়ে।
ত্রিশ কি চল্লিশ কি পঞ্চাশ হবে।
একটানা কথা বলছে। কেউ কারো কথা শুনছে না। শুধু বলে যাচ্ছে।
কতগুলো মুখ।
মিছিলের মুখ।
রোদে পোড়া।
ঘামে ভেজা।
শপথের কঠিন উজ্জ্বল দীপ্তির ভাস্বর।
এগিয়ে আসছে সামনে।
জ্বলন্ত সূর্যের প্রখর দীপ্তিকে উপেক্ষা করে।
সহসা কতগুলো মুখ।
শাসনের-শোষণের-ক্ষমতার-বর্বরতার মুখ।
এগিয়ে এলো মুখোমুখি।
বন্দুকের আর রাইফেলের নলগুলো রোদে চিকচিক করে উঠলো।
সহসা আগুন ঠিকরে বেরুলো।
প্রচণ্ড শব্দ হলো চারদিকে।
গুলির শব্দ।
কচুপাতার উপর থেকে শিশির ফোঁটাগুলো গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।
মাছরাঙা পাখিটা ছুটে পালিয়ে গেলো ডাল থেকে।
ন্যাংটা ছেলেটার হাত থেকে পড়ে গিয়ে স্লেট ভেঙে গেলো।
পাখিরা নীরব হলো।
মেয়েগুলো সব স্তব্ধ নির্বাক দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালো।
একরাশ কৃষ্ণচূড়া ঝরে পড়লো গাছের ডাল থেকে।
সূর্যের প্রখর দীপ্তির নিচে— একটা নয়, দুটো নয়। অসংখ্য কালো পতাকা এখন।
উদ্ধত সাপের ফণার মতো উড়ছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি।
সন উনিশ'শ বায়ান্ন।
খুব ছোট ছোট স্বপ্ন দেখতো।
চাষার ছেলে গফুর।
একটা ছোট্ট ক্ষেত।

একটা ছোট্ট কুঁড়ে।
আর একটা ছোট্ট বউ।
ক্ষেতের মানুষ সে।
লেখাপড়া করেনি।
সারাদিন ক্ষেতের কাজ করতো।
গলা ছেড়ে গান গাইতো।
আর গভীর রাতে পুরো গ্রামটা যখন ঘুমে ঢলে পড়তো তখন ছোট মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে পুঁথি পড়তো সে, বসে বসে।
সুর করে পড়তো ছহি বড় সোনাভানের পুঁথি। ছয়ফল মুল্লুকের পুঁথি।
আমেনাকে দেখেছিলো একদিন পুকুরঘাটে।
পরনে লাল সবুজ ডুরে শাড়ি।
ঘোমটার আড়ালে ছোট্ট একটি মুখ।
কাঁচা হলুদের মতো রঙ।
ভালো লেগেছিলো।
বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে মেয়ের বাবা রাজি হয়ে গেলো।
ফর্দ হলো।
গফুরের মনে খুশি যেন আর ধরে না।
ক্ষেতভরা পাকাধানের শীষগুলোকে আদরে আলিঙ্গন করলো সে।
রসভরা কলসিটাকে খেজুরের গাছ থেকে নামিয়ে এনে একনিশ্বাসে পুরো কলসিটা শূন্য করে দিলো সে।
জোয়ালে বাঁধা জীর্ণ-শীর্ণ গরু দুটোকে দড়ির বাঁধন থেকে ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে বললো—
যা আজ তোদের ছুটি।
গফুর শহরে যাবে।
বিয়ের ফর্দ নিয়ে।
সবকিছু নিজের হাতে কিনবে সে।
শাড়ি, চুড়ি, আলতা, হাঁসুলি।
অনেক কষ্টে সঞ্চয়-করা কতগুলো তেল চিটচিটে টাকার কাগজ রুমালে বেঁধে নিলো সে।
বুড়িগঙ্গার ওপর দিয়ে খেয়া পেরিয়ে শহরে আসবে গফুর। বিয়ের বাজার করতে।
গফুরের দু-চোখে ঘরবাঁধার স্বপ্ন।

বাবা আহমেদ হোসন।
পুলিশের লোক।
অতি সচ্চরিত্র।
তবু প্রমোশন হলো না তাঁর।
কারণ, তসলিম রাজনীতি করে।
ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা দেয়।

সরকারের সমালোচনা করে।
ছেলেকে অনেক বুঝিয়েছেন বাবা।
মেরেছেনও।
যাঁর ধমকে দাগি চোর, ডাকাত, খুনি আসামিরা ভয়ে থরথর করে কাঁপতো— তাঁর অনেক শাসন, তর্জন-গর্জনেও তসলিমের মন টললো না।
মিছিলের মানুষ সে।
মিছিলেই রয়ে গেলো।
মা কাঁদলেন।
বোঝালেন, দিনের পর দিন।
আত্মীয়-স্বজন সবাই অনুরোধ করলো।
বললো বুড়ো বাপটার দিকে চেয়ে এসব এবার ক্ষান্ত দাও। দেখছো না ভাইবোনগুলো সব বড় হচ্ছে। সংসারের প্রয়োজন দিনদিন বাড়ছে। অথচ প্রমোশনটা বন্ধ হয়ে আছে।
কিন্তু নিষ্ঠুর-হৃদয় তসলিম বাবার প্রমোশন, মায়ের কান্না, আত্মীয়দের অনুরোধ, সংসারের প্রয়োজন সবকিছুকে উপেক্ষা করে মিছিলের মানুষ মিছিলেই রয়ে গেলো।
কিন্তু এই নিষ্ঠুর হৃদয়ে একটা কোমল ক্ষত ছিলো।
সালমাকে ভালোবাসতো সে।
সালমা ওর খালাতো বোন।
একই বাড়িতে থাকতো।
উঠতো বসতো চলতো।
তবু মনে হতো সালমা যেন অনেক-অনেক দূরের মানুষ।
তসলিমের হৃদয়ের সেই কোমল ক্ষতটির কোনো খোঁজ রাখতো না সে।
কিম্বা রাখতে চাইতো না।
বহুবার চেষ্টা করেছে তসলিম।
বলতে বোঝাতে। কিন্তু সালমার আশ্চর্য ঠাণ্ডা চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারেনি সে।

এককালে ভালো কবিতা লিখতেন তিনি।
এখন সরকারের লেজারের টাকার অঙ্ক থরেথরে লিখে রাখা তাঁর কাজ।
কবি আনোয়ার হোসেন।
এখন কেরানি আনোয়ার হোসেন।
তবু কবি-মনটা মাঝেমাঝে উঁকি দিয়ে যায়। যখন তিনি দিনের শেষে রাতে ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেন।
ঝগড়া করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন।
যখন এ দেহ মন জীবন আর পৃথিবীটাকে নোংরা একটা ছেঁড়া কাঁথার মতো মনে হয়, তখন একান্তে বসে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে তাঁর।
আনোয়ার হোসেনের জীবনে অনেক অনেক দুঃখ।
ঘরে শান্তি নেই। স্ত্রীর দুঃখ।
বাসায় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। থাকার দুঃখ।

সংসার চালানোর মতো অর্থ কিম্বা রোজগার নেই। বাঁচার দুঃখ।
কবিতা লিখতে বসে দেখেন ভাব নেই। আবেগের দুঃখ।
শুধু একটি আনন্দ আছে তার জীবনে। যখন তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে সামনে পানের দোকান থেকে কয়েকটা পান কিনে নিয়ে মুখে পুরে চিবুতে থাকেন। আর পথ চলতে চলতে কবিতা লেখার দিনগুলোর কথা ভাবতে থাকেন। তখন আনন্দে ভরে ওঠে তার সারা দেহ।
কবি আনোয়ার হোসেন, ঘর আর অফিস, অফিস আর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও যান না।
যেতে ভালো লাগে না, তাই।
কোনোদিন পথে কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে হয়তো একটা কি দুটো কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করেন। তারপর এড়িয়ে যান।
ভালো লাগে না।
কিছু ভালো লাগে না তাঁর।

অর্থ আর প্রাচুর্যের অফুরন্ত সমাবেশ।
অভাব বলতে কিছু নেই, মকবুল আহমদের জীবনে।
বাড়ি আছে।
গাড়ি আছে।
ব্যাংকে টাকা আছে।
ছেলেমেয়েদের নামে ইনসুরেন্স আছে কয়েকখানা।
ব্যবসা একটা নয়।
অনেক। অনেকগুলো।
পানের ব্যবসা।
তেলের ব্যবসা।
পাটের ব্যবসা।
পারমিটের ব্যবসা।
সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে।
কখনো মন্ত্রীর দফতরে।
কখনো আমলাদের সভা-সমিতিতে।
তাঁর জীবনেও দুঃখ অনেক।
দুটো পাটকল বসাবার বাসনা ছিলো। একটার কাজও এখনো শেষ হলো না। শ্রমের দুঃখ।
বড় ছেলেটাকে বাচ্চা বয়সেই বিলেতে পাঠিয়ে ভালো শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু স্ত্রী তার সন্তানকে কাছছাড়া করতে রাজি না। জাগতিক দুঃখ।
তেলের কলের শ্রমিকগুলো শুধু বেতন বাড়াবার জন্য সারাক্ষণ চিৎকার করে, আর হরতালের হুমকি দেয়। দুঃখ। উৎপাদনের দুঃখ।
কিছু ছেলে ছোকরা আর গুণ্ডা জাতীয় লোক পথে-ঘাটে মাঠে-ময়দানে মিছিল বের করে। সভা বসিয়ে সরকারের সমালোচনা করে। যাদের টাকা আছে তাদের সব টাকা গরিবদের বিলিয়ে দিতে বলে। দুঃখ। দেশের দুঃখ।

এই অনেক দুঃখের মধ্যেও একটা আনন্দ আছে তাঁর। যখন সারাদিনের ব্যস্ততার শেষে রাতে ক্লাবের এককোণে চুপচাপ বসে বোতলের পর বোতল নিঃশেষ করেন তিনি। তখন অদ্ভুত এক আনন্দে ভরে ওঠে তার চোখমুখ। স্ত্রী বিলকিস বানুর সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখা হয়। একই বাড়িতে থাকেন। এক বিছানায় শোন। কিন্তু কাজের চাপে, টেলিফোনের অহরহ যন্ত্রণায় স্ত্রীর সঙ্গে বসে দু-দণ্ড আলাপ করার সময় পান না তিনি। অথচ স্ত্রীকে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন।
তার সুখশান্তির উপর লক্ষ রাখেন।
এবং যখন যা প্রয়োজন মেটাতে বিলম্ব করেন না।
স্বামীর সঙ্গ পান না, সেজন্যে বিলকিস বানুর মনে কোনো ক্ষোভ নেই।
কারণ, সঙ্গ দেয়ার লোকের অভাব নেই তাঁর জীবনে।

সেলিমও স্বপ্ন দেখে।
একটা রিকশা কেনার স্বপ্ন।
বারো বছর ধরে মালিকের রিকশা চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে।
সারাদিনের পরিশ্রম শেষে তিনটি টাকা রোজগার হলে দুটো টাকা মালিককে দিয়ে দিতে হয়।
একটা টাকা থাকে ওর।
সেই টাকায় বউ আর বাচ্চাটাকে নিয়ে দিনের খাওয়া হয়।
মাসের বাড়ি ভাড়া।
বিড়ি কেনা।
আর সিনেমা দেখা।
পোষায় না তার।
দেশ কী সে জানে না।
সভা-সমিতি-মিছিলে লোকগুলো কেন এত মাতামাতি করে তার অর্থ সে বোঝে না।
পুলিশেরা যখন ছাত্রদের ধরে ধরে পেটায় তখন সে অবাক চোখে চেয়ে-চেয়ে দেখে।
কোনো মন্তব্য করে না।
তার ভাবনা একটাই।
একটা রিকশা কিনতে হবে।
আরো একটা ভাবনা আছে তার। মাঝে মাঝে ভাবে।
ছেলেটা আর একটু বড় হলে তাকেও রিকশা চালানো শেখাতে হবে।

খেয়াঘাট পেরিয়ে শহরে এলো গফুর।
বগলে একটা ছোট্ট কাপড়ের পুঁটলি।
পুঁটলিতে বাঁধা একটা বাড়তি লুঙি, জামা আর কিছু পিঠে।
শহরে নেমেই সে অবাক হয়ে দেখলো মানুষগুলো সব কেমন যেন— উত্তেজনায় উত্তপ্ত।
এখানে সেখানে জটলা বেঁধে কী যেন আলাপ করছে তারা।
খবরের কাগজের হকাররা অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করছে।
কাগজ কেনার ধুম পড়েছে চারদিকে।

সবাই কিনে কিনে পড়ছে।
উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এদেশের।

না ! না !!
চিৎকার করে উঠলেন কবি আনোয়ার হোসেন।
আমি মানি না।
উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিলেন তিনি।
মুষ্টিবদ্ধ তাঁর হাত।
স্ত্রী অবাক হয়ে তাকালো তাঁর দিকে।
স্বামীকে এত জোরে চিৎকার করতে কোনোদিন দেখেনি সে।
কেন কী হয়েছে ?
ওরা বলছে বাংলাকে ওরা বাদ দিয়ে দেবে। উর্দু, শুধু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবে ওরা। জানো সালেহা, যে-ভাষায় আমরা কথা বলি, যে-ভাষায় আমি কবিতা লিখি, সে-ভাষাকে বাদ দিয়ে দিতে চায় ওরা।
সে কিগো ! আমরা তাহলে কোন্ ভাষায় কথা বলবো ?
ভয়ার্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকায় সালেহা।
না। না। আমি অন্যের ভাষায় কথা বলবো না। আমি নিজের ভাষায় কথা বলবো।
কবি আনোয়ার হোসেন চিৎকার করে উঠলেন।

বজ্র থেকে ধ্বনি নিয়ে গর্জন করে উঠলো তসলিম।
এই সিদ্ধান্ত আমি মানি না।
আমরা মানি না।
মানি না !
মানি না !!
মানি না !!!
আমতলায় ছাত্রদের সভাতে অনেকগুলো কণ্ঠ একসুরে বলে উঠলো— আমরা মানি না।
বাচ্চারা কোনো কিছুই সহজে মানতে চায় না।
তাদের মানিয়ে নিতে হয়।
আমলাদের সভায় মেপে-মেপে কথাগুলো বললেন মকবুল আহমেদ।
প্রথমে আদর করে দুধকলা খাইয়ে ওদের মানিয়ে নিতে হয়। তবু যদি না মানে চাবুকটাকে তুলে নিতে হবে হাতে। মানবে না কী ? মানতে বাধ্য হবে তখন।

কতগুলো মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে তুলে শ্লোগান দিচ্ছে—
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
বাংলা চাই।
আজ পান খাওয়া ভুলে গেলেন কবি আনোয়ার হোসেন। সেদিকে তাকিয়ে চোখজোড়া আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠলো তাঁর।
ভুলে গেলেন—কখন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

তিনি দেখছেন মিছিলের মুখগুলো।
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
পেছন থেকে কে যেন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো তাঁকে।
কী সাব ! রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কী দেখেন ? বেল বাজাই শোনেন না ?
রিকশাচালক সেলিম।
তার রিকশাটা নিয়ে এগিয়ে যায় সামনে। ছেলেগুলো চিৎকার করছে। করুক। ওতে তার কোনো উৎসাহ নেই।
পারবে না। তুমি দেখে নিও। ওরা জোর করে উর্দুকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারবে না।
গদগদ কণ্ঠে স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কবি আনোয়ার হোসেন। ছেলেরা খেপেছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে ওরা ছাড়বে না।
স্ত্রী পান খাচ্ছিলো।
একটুকরো চুন মুখে তুলে বললো— হ্যাঁ গো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে তোমার বেতন কি বেড়ে যাবে ? ক'টাকা বাড়বে বলোতো ?

কী যে হবে দেশের কিছু জানি না। বিদেশের চর এসে ভরে গেছে পুরো দেশটা।
স্ত্রীর সঙ্গে বহুদিন পরে আজ কথা বলতে বসলেন মকবুল আহমদ।
বাংলা বাংলা করে চিৎকার করছে ওরা। বাংলা কি মুসলমানের ভাষা নাকি ? ওটাতো হিন্দুদের ভাষা। হিন্দুরা এ দেশটাকে জাহান্নামে নেবে।
কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন বিলকিস বানু।
কোথায় উর্দু আর কোথায় বাংলা। উর্দু হচ্ছে খানদানি ভাষা। আমাদের ফ্যামেলিতে বাবা মা সবাই উর্দুতে কথা বলেন।

উর্দু-বাংলা আমি কিছু বুঝি না। আমার সোজা কথা তোমার ছেলেকে সাবধান করে দাও। ও যদি আবার সভা-সমিতি আর আন্দোলন করে তাহলে এদ্দিন প্রমোশন বন্ধ হয়ে ছিলো, এবার আমার চাকরিটাই যাবে। তসলিমের পুলিশ-বাবা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন।
মা-ও শিউরে উঠলেন।
অনাগত ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা ভাবতে গিয়ে চোখে পানি এসে গেলো তাঁর।
তুই কেমন নিষ্ঠুর ছেলেরে !
তসলিমকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি।
তোর বাবা-মা ভাই-বোনগুলোর কথা ভেবেও কি তুই ওসব ক্ষান্ত দিতে পারিস না ? চাকরিটা চলে গেলে আমরা খাবো কী ?
তসলিম নিশ্চুপ।
সালমা বললো—
খালুজান ক'দিন ধরে আপনার চিন্তায় খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন। এসব কাজ না করলেই—তো পারেন। কী হবে এসব করে ?

সালমার দিকে অবাক হয়ে তাকালো তসলিম। এর মধ্যে সালমাকে অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে হয়েছিলো তার। কিন্তু কিছুই বললো না। শুধু বললো— তুমি ওসব বুঝবে না।

সদরঘাটে যেখানে অনেকগুলো খেয়ানৌকা ভিড় করে থাকে তার কাছাকাছি একটা ইট টেনে নিয়ে বসে পড়লো গফুর।
খিদে পেয়েছে। খাবে।
পুঁটলিটা ধীরেধীরে খুললো সে।
শহরের লোকজনদের সে বলতে শুনেছে–কাল নাকি হরতাল।
শহরের সমস্ত দোকান–পাট বন্ধ থাকবে।
গাড়িঘোড়া চলবে না।
হরতাল কী গফুর বোঝে না।
পিঠা খেতে–খেতে সে নানাভাবে হরতালের একটা অবয়ব চিন্তা করতে লাগলো। কিন্তু হরতালের কোনো সঠিক চেহারা নির্ণয় করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না।
সে ভাবলো, এটা হয়তো শহরেরই বিশেষ একটা রীতি কিম্বা নীতি। মাঝে মাঝে শহরের মানুষেরা এ–রকম হরতাল পালন করে থাকে।
উঠে গিয়ে দু–হাতে বুড়িগঙ্গার পানি তুলে নিয়ে পান করলো গফুর। গামছায় মুখ হাত মুছলো। তারপর ট্যাঁক থেকে রুমালটা বের করে টাকাগুলো গুণে গুণে বারকয়েক দেখলো সে।
কাল দোকান–পাট বন্ধ থাকবে।
কেনাকাটা আজকেই শেষ করতে হবে।
মুহূর্তে আমেনার মুখ মনে পড়লো তার।
কী করছে আমেনা এখন।
হয়তো পুকুরঘাটে পানি নিতে এসেছে।
কিম্বা ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে।
অথবা কচুবনে ঘুরে কচুশাক তুলছে।
সাতদিন পর বিয়ে।
ভাবতে বড় ভালো লাগলো গফুরের।
সহসা বিকট একটা আওয়াজ শুনে চমকে তাকালো গফুর।
দেখলো কয়েকটি ছেলে মুখে চোঙা লাগিয়ে চিৎকার করে বলছে—
কাল হরতাল।
আমাদের মুখের ভাষাকে ওরা জোর করে কেড়ে নিতে চায়।
আমাদের প্রাণের ভাষাকে ওরা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। কিন্তু আমরা মাথা নোয়াবো না।
আমরা আমাদের ভাষাকে কেড়ে নিতে দেবো না।
আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
আর সে দাবিতে কাল হরতাল।
সবাই হরতাল পালন করুন।
গফুর অবাক হয়ে শুনলো।
সে ভাবলো কাউকে জিজ্ঞেস করবে ব্যাপারটা কী! কিন্তু সাহস পেলো না।

অদূরে একটা লোক তাসের খেলা দেখাচ্ছিলো।
নানারকম খেলা।
আজগুবি খেলা।
গফুর ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে খেলা দেখতে লাগলো।

কিসের হরতাল ?
আমি হরতাল মানি না।
রিকশার ব্রেকটা খারাপ হয়ে গেছে। সেটা ঠিক করতে-করতে আপনমনে গজগজ করে উঠলো সেলিম।
রিকশা না চালালে আমি রোজগার করবো কোত্থেকে ?
আমি খাব কী ?
আমার বউ খাবে কী ?
আমার ছেলে খাবে কী ?
ওসব হরতালের মধ্যে আমি নেই।
ব্রেকটা ঠিক করে সবে রিকশাটা নিয়ে সামনে এগুতে যাবে সে—এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ডাকলো—
ভাড়া যাবে ?
সেলিম দেখলো একটা ছেলে।
বোধহয় ছাত্র।
হাতে বই।
বগলে একগাদা কাগজ।
কোথায় যাবেন স্যার ?
ইউনিভার্সিটি।
ওঠেন।
তসলিম রিকশায় উঠে বসতেই সেলিম প্রশ্ন করলো—
আপনারা কালকে হরতাল করছেন কেন ? রিকশা না চালালে আমরা রুজি-রোজগার করবো কেমন করে ? হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকবো নাকি ?
মুহূর্তে-কয়েক সময় নিলো তসলিম। তারপর ধীরেধীরে বললো—
আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আর ওরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। উর্দু যদি রাষ্ট্রভাষা হয় তাহলে বাংলাভাষা এদেশ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে। তোমাকে আমাকে আমাদের সবাইকে উর্দুতে কথা বলতে হবে।
উর্দু আমি কিছুকিছু জানি।
সেলিম বিজ্ঞের মতো বললো—
কিন্তু আমার বউ উর্দু একেবারে বোঝে না। ও মুন্সিগঞ্জের মেয়ে কিনা তাই। তবে ছেলেকে আমি উর্দু-বাংলা দুটোই শেখাচ্ছি।
তসলিম বললো—
উর্দুর সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আমরা উর্দু-বাংলা দুটোকেই সমানভাবে চাই।
কিন্তু হরতাল করছেন কেন ?
হরতালের মাধ্যমে আমরা বিক্ষোভ জানাতে চাই। আমাদের প্রতিবাদ জানাতে চাই।

অ।
কিছু না বুঝলেও বারকয়েক ঘাড় দোলালো সেলিম।

সরকারের চাকুরি করি বলে কি আমরা আমাদের মতামতটাও বন্ধক দিয়ে দিয়েছি নাকি? আমরা কি ওদের ক্রীতদাস যে, কথামতো আমাদের চলতে হবে ?
চেয়ারে বসে ছটফট করতে লাগলেন কবি আনোয়ার হোসেন।
বড়কর্তার হুকুম এসেছে। কাল সবাইকে সময়মতো অফিসে হাজির হতে হবে। হরতাল করা চলবে না। যে হাজির হবে না তাকে সাসপেন্ড করা হবে। কেন ? আমাদের ভাষাটাকে তোমরা জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে ? আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো ? কুকুর-বেড়ালেরও নিজস্ব একটা ভাষা আছে। দেখি ওদের মুখ বন্ধ করে দাও তো ! তোমাদের ছেড়ে দেবে ? কামড়ে-আঁচড়ে গায়ের রক্ত বের করে দেবে না ? ওসব হুকুম আমি মানিনা। যদি চাকরি যায় যাবে। মুটেগিরি করবো। দরকার হলে রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রি করবো। কিন্তু আমাকে তোমরা ক্রীতদাস বানিয়ে দেবে সেটা চলবে না।
রাগে গজগজ করতে লাগলেন কবি আনোয়ার হোসেন।
ব্যস্ কাল হরতাল। আমি অফিসে যাবো না— যা হয় হোক।
হিসেবের খাতাটা বন্ধ করে টেবিলের এককোণে রেখে দিলেন তিনি।

ওসব হরতালের হুমকিতে মাথা নোয়ালে দেশ চলবে না। হরতাল বন্ধ করতে হবে। সভা-সমিতি ভেঙে দিতে হবে। রাস্তায় মিছিল করা বে-আইনি ঘোষণা করতে হবে। তবে ঠাণ্ডা হবে ওরা।
আমলাদের সামনে লম্বা ভাষণ দিলেন মকবুল আহমদ।
মন্ত্রীরা ছুটোছুটি করছে।
একমুহূর্তের বিশ্রাম নেই।
নেতারা তর্ক-বিতর্কে মেতে উঠেছেন।
আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলছেন।
যে করেই হোক হরতাল বন্ধ করতে হবে।
রাস্তায় মিছিল বের করা বে-আইনি করতে হবে।
পাড়ার মাতব্বরদের ডাকা হয়েছে।
তাদের সঙ্গে পরামর্শ চলছে।
যত লোক লাগে আমরা দেবো।
যত টাকা লাগে আমরা যোগাবো।
পুলিশের প্রয়োজন হলে পুলিশ দেবো।
সব কিছুই পাবেন আপনারা।
হরতাল বন্ধ করতে হবে।
মিছিল বন্ধ করতে হবে।
মাতব্বররা ঘাড় নোয়ালেন।
নামাজের সেজদা দেবার মতো।

কতগুলো উদ্ধত মুখ।
ঋজু।

কঠিন।
একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো।
না।
আমরা মানি না।
সরকার একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে আমাদের মুখ বন্ধ করে দেবে। প্রতিবাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে আমাদের। সে অন্যায় আমরা মাথা পেতে নেবো না।
আইন দিয়ে ওরা আমাদের শৃঙ্খলিত করতে চায়। সে শৃঙ্খল আমরা ভেঙে চুরমার করে দেবো।
আমরা গরু ছাগল ভেড়া নই যে, প্রয়োজনবোধে খোঁয়াড়ের মধ্যে বন্ধ করে রাখবে।
তর্ক-বিতর্ক চললো অনেক অনেকক্ষণ ধরে।
আলোচনার ঝড় উঠলো।
কেউ বললো—
এ আইন অমান্য করা ঠিক হবে না।
কেউ বলল-
এ আইন শোষণের আইন। এ আইন আমরা মানি না।
বুড়োরাত বাড়তে লাগলো ধীরেধীরে।
কাল কী হবে কেউ জানে না।
রাস্তায় পুলিশ নেমেছে। পুলিশের গাড়ি ইতস্তত ছুটোছুটি করেছে।
পথ-ঘাটগুলো জনশূন্য।

একটা খালি রক পেয়ে তার উপরে গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়লো গফুর।
দুটো শাড়ি কিনেছে সে।
একশিশি আলতা।
কিছু চুড়ি।
একটা নাকফুল।
সেগুলো বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নানা কথা ভাবতে লাগলো সে।
আমেনার কথা।
বিয়ের পর কেমন করে সংসার করবে সে কথা।
আর কোনোদিন যদি ছেলেপুলে হয় তার কথা।
ইচ্ছে করলে সে আজ গ্রামে ফিরে যেতে পারতো। কিন্তু যায়নি। কারণ, সে হরতাল দেখবে।
হয়তো কোনোদিন আর শহরে আসা নাও হতে পারে। তাই হরতাল সে দেখে যাবে।
দু-একটা কেনাকাটাও বাকি রয়ে গেছে।
একটা লাল লুঙি কিনবে ভেবেছিলো সে।
কয়েক দোকানে ঘোরাঘুরিও করেছিলো।
কিন্তু ওরা বড় চড়া দাম চায়।
তাই গফুর ভাবলো, যদি কম দামে পাওয়া যায়। আর যদি দু-একটা দোকান-পাট খোলা থাকে তাহলে সে কিনবে সেটা।

লাল লুঙি আমেনা ভীষণ পছন্দ করে।
শুয়ে শুয়ে গফুর দেখলো দুটো পুলিশের গাড়ি ছুটে চলে গেলো রাস্তা দিয়ে।
গফুর চোখ বন্ধ করলো।

কবি আনোয়ার হোসেন উত্তেজিতভাবে ঘরের ভেতরে পায়চারি করলেন অনেকক্ষণ ধরে।
সালেহা ডাকলো—
কই, শোবে না ?
না।
শান্ত গলায় জবাব দিলেন কবি—
জানো সালেহা, আজ বহুদিন পর আমার কী মনে হচ্ছে জানো ? মনে হচ্ছে, আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেলো। আমি কবি হতে চেয়েছিলাম। কবিতা লিখতাম। কবিতা ছিল আমার স্বপ্ন। আমার সাধনা। ভেবেছিলাম সারাটা জীবন আমি কবিতা লিখেই কাটিয়ে দেবো। কিন্তু আমি—সেই আমি—দেখ আজ লেজার লিখতে লিখতে ক্লান্ত।
সালেহা সহানুভূতির সঙ্গে তাকালো তার দিকে।
লেখো না কেন ? মাঝে মাঝে লিখলেই তো পারো। তুমি তো কবিতা লিখেই আমাকে পাগল করেছিলে, মনে নেই !
কথা শুনে সহসা শব্দ করে হেসে উঠলেন কবি আনোয়ার হোসেন।
মনে আছে সালেহা। মনে থাকবে না কেন ? শুধু কী জানো ! আমার সেই মনটা নেই, যে মন নিয়ে একদিন আমি কবিতা লিখতাম। আমার সেই মনটা না, লেজারের চাপে দুমড়ে গেছে। মরে গেছে।
এসো এখন শুয়ে পড়ো।
সালেহা ডাকলো।
না।
আবার বললেন আনোয়ার হোসেন।
তার সারা মুখে কী এক অস্থিরতা।
স্ত্রীর কাছে এসে বসলেন তিনি—
সালেহা, আমি ঠিক করেছি, আমি আর ও চাকরি করবো না। এসব সরকারি চাকরি মানুষকে ক্রীতদাস করে ফেলে। আমি ছেড়ে দেবো। যেখানে আমার সামান্য স্বাধীনতা নেই, সেখানে কেন আমি কলুর বলদের মতো ঘানি টেনে যাবো ? আমি আবার কবিতা লিখবো সালেহা। যে কবিতা পড়ে তোমার একদিন আমাকে ভালো লেগেছিলো—তেমনি কবিতা লিখবো আমি।
সালেহার পুরো চেহারায় কে যেন আলকাতরা লেপে দিলো।
না, না ! চাকরি ছাড়া ঠিক হবে না। তাহলে সংসার চলবে কী করে ? কবিতা লিখে তো আর টাকা পাবে না তুমি !
টাকা ! টাকাটাই কি জীবনের সব কিছু সালেহা ? মানুষের মন বলে কি কিছুই নেই ?
শোনো। ওসব চিন্তা এখন রাখো।
সালেহা স্বামীর হাত ধরলো।
এসো এখন শুয়ে পড়া যাক। কাল আবার ভোরে-ভোরে উঠতে হবে না !

আমি কিন্তু কাল অফিসে যাবো না।
কেন ?
আমি হরতাল করবো। ওরা নিষেধ করেছে। বলেছে চাকরি যাবে, যাক। সেটা পরোয়া করি না। আমার ভাষার চেয়ে কি চাকরি বড় ?

কাল কী হবে কে জানে। হয়তো মারাত্মক কিছুও ঘটতে পারে।
বসে বসে ভাবলো তসলিম।
জীবনে এই প্রথম অনুভূতির জন্ম নিলো তার মনে।
একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙতেই হবে। নইলে আন্দোলন এখানেই শেষ হয়ে যাবে।
বাংলা ভাষাকে চিরতরে নির্মূল করে দেবে ওরা।
আর একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙতে গেলে হয়তো পুলিশ গুলিও চালাতে পারে।
হয়তো তসলিম মারা যাবে।
নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতে গিয়ে সহসা শিউরে উঠলো সে।
মনে হলো যেন নিজের মৃত্যুকে সে এ-মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করছে।
ভাত খাবেন না !
সালমার কণ্ঠস্বরে চমকে তাকালো তসলিম।
সালমা বলল—
তরকারি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, চলুন।
বলে চলে যাচ্ছিলো সালমা।
সহসা পেছন থেকে তাকে ডাকলো তসলিম—
সালমা, শোনো ! তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।
সালমা ফিরে তাকালো।
নীরব দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলো-
কি, বলুন ?
সে-চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না তসলিম।
চোখ নামিয়ে নিয়ে ধীরেধীরে বললো—
কথাটা আমার তুমি কিভাবে নেবে জানি না, হয়তো তুমি রাগ করবে—।
বলতে গিয়ে থেমে গেলো সে।
সালমা নীরব।
কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।
সহসা তসলিম আবার বললো—
বহুবার ভেবেছি বলবো তোমাকে। বলা হয়নি। হয়তো কোনোদিন বলতাম না। কিন্তু আজ কেন জানিনা বলতে ভীষণ ইচ্ছে করছে আমার !
আবার নীরব হলো তসলিম।
সালমা মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে আছে।
মনে হলো ও মুখখানা কৃষ্ণচূড়ার রঙে ভরে গেছে।
সালমা বললো—
চলুন, এখন খেয়ে নিন।

না না সালমা, যদি কাল কোনো অঘটন ঘটে ? ধরো যদি আমি মারা যাই। তাহলে ?
মেয়েটি শিউরে উঠলো।
চোখজোড়া মুহূর্তে ছলছল করে উঠলো তার।
ছিঃ। এসব কী বলছেন আপনি ! মরবেন কেন ? আপনি অনেক অনেক দিন বাঁচবেন। আসুন, এখন খেয়ে নিন। চলুন।
কথাটা শুনবে না ?
না এখন না। পরে শুনবো।
উত্তরের অপেক্ষা না করেই সামনে থেকে সরে গেল সালমা।

তুমি কি কাল বাইরে বেরুবে, না ঘরে থাকবে ?
বিছানায় শোবার আগে মুখে ক্রিম ঘষতে ঘষতে স্বামীকে প্রশ্ন করলেন বিলকিস বানু।
হ্যাঁ, বেরুবো বৈ কী। বেরুবো না কেন ?
না, বলছিলাম কী— যদি হরতাল হয় তাহলে ?
হরতাল মোটেও হবে না। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।
বিজ্ঞের মতো জবাব দিলেন মকবুল আহমদ।
হরতালের সব রাস্তা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।
যে হরতাল করবে তার লাইসেন্স আমরা কেড়ে নেবো। কেউ যদি অফিসে না আসে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করবো। আমরা জানিয়ে দিয়েছি। পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছি সবাইকে। তারপরও কি কেউ হরতাল করবে বলে মনে হয় তোমার ?
স্লিপিং স্যুটটা পরে নিয়ে বিছানায় এসে শুলেন মকবুল আহমদ।
কিন্তু ছাত্ররা হয়তো একটু-আধটু গোলমাল করতে পারে।
তাও আমরা ভেবে রেখেছি।
ক্রিম ঘষা শেষ হলে বিলকিস বানু বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে বসলেন।
আমার কি মনে হচ্ছে জানো ? কাল কোনো একটা কিছু হয়তো হতেও পারে। তুমি যেদিকে খুশি যেয়ো, কিন্তু ওই ছাত্রদের পাড়ায় গাড়ি নিয়ে যেয়ো না।
তুমি মিছেমিছি ভাবছো। শুয়ে পড়ো এখন।
চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন মকবুল আহমদ।

ভোর হবার আগেই ঘুম ভেঙে গেলো গফুরের।
চেয়ে দেখলো পথ-ঘাটগুলো তখনো জনশূন্য।
দুটো কুকুর রাস্তার মাঝখানে বসে ঝগড়া করছে।
গফুর উঠে বসলো।
পুঁটলিতে রাখা জিনিসপত্রগুলো পরখ করে দেখলো একবার।
পুবের আকাশে সবে ধলপহর দিয়েছে।
দু-পাশের উঁচুউঁচু দালানগুলোকে আকাশের পটভূমিতে ছায়ার মতো মনে হচ্ছে।
দু'একটা কাক গলা ছেড়ে চিৎকার করছে।
মাঝে মাঝে রাস্তায় নেমে এসে খাবার খুঁজছে।
আবার উড়ে গিয়ে বসছে টেলিগ্রামের তারের উপর।

দুটো মেয়ে রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে।
আবর্জনা পরিষ্কার করছে।
রাস্তার পাশে একটা কল থেকে হাতমুখ ধুলো গফুর।
ততক্ষণে লোকজন পথে চলতে শুরু করেছে।
দু-একটা রিকশার টুংটাং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।
একটা-দুটো করে দোকান-পাট খুলছে।
টাউন সার্ভিসের বাসগুলো মানুষ ভর্তি করে ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে।
হরতাল।
কোথায় হরতাল ?
গফুর অবাক হয়ে তাকালো চারপাশে।

সেলিম তার রিকশাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়।
যাবার সময় বৌকে বলে গেলো—
কালুকে আজ রাস্তায় বেরুতে দিস না। গোলমাল হতে পারে।
কালু ওর ছেলের নাম।

মকবুল আহমদও বেরুলেন বাইরে।
স্ত্রী বিলকিস বানুকে সঙ্গে নিয়ে।
ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন রেসকোর্স ঘুরে সেক্রেটারিয়েটের দিকে যাবার জন্য।
পুরোনো শহরেও একবার যাবেন তিনি।
কারখানায় যাবেন।
অফিসপাড়াগুলো ঘুরবেন।
হরতাল ব্যর্থ হয়েছে কি হয়নি তাই তদারক করবেন তিনি।
বিলকিস বানু সহসা শব্দ করে হেসে উঠলেন।
ওই যে দ্যাখো দ্যাখো। একটা বাস আসছে। দুটো রিকশা। একটা ঘোড়ার গাড়ি। ওটা একটা প্রাইভেট কার, না !
দুজনের মুখে হাসি।
চারপাশে সন্ধানী-দৃষ্টি নিয়ে কী যেন খুঁজছেন তারা।
রাস্তায় গাড়ি দেখলে কিম্বা দোকান খুলছে নজরে এলে উল্লাসে ভরে উঠছে তাদের চোখ-মুখ।
তোমাকে বলিনি আমি।
সগর্বে স্ত্রীর দিকে তাকালেন মকবুল আহমদ।
কেউ হরতাল করবে না। দেশের দুশমনদের সাথে কেউ যোগ দেবে না। স্বামীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন বিলকিস বানু।

তুমি কি সত্যিসত্যি আজ অফিসে যাবে না ?
বাইরে বেরুবার মুহূর্তে প্রশ্ন করলো সালেহা।
একটা কথার আর ক'বার উত্তর দেবো বলো তো ?

কবি আনোয়ার হোসেন রেগে গেলেন—
বলছি তো যাবো না।
তাহলে এখন বেরুচ্ছো কোথায় ?
পথ রোধ করে দাঁড়ালো সালেহা।
বাইরে হরতাল কেমন হলো দেখতে যাবো।
তারপর ?
তারপর ইউনিভার্সিটিতে যাবো। ছাত্ররা কী করছে।
না। আমি তোমাকে বেরুতে দেবো না।
সালেহা দৃঢ়কণ্ঠে বললো—
শেষে কোথায় গিয়ে কী করবে—পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। তখন আমার কী অবস্থা হবে শুনি ?
দ্যাখো, বাজে বকো না। পথ ছাড়ো। পুলিশে ধরবে। আমি তার তোয়াক্কা করি না। আর আমার যদি কিছু হয় তাহলে তুমি বাপের বাড়ি চলে যেয়ো।
উত্তরের আর অপেক্ষা করলেন না আনোয়ার হোসেন।
বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ভোররাতে পুলিশের পোশাক পরে কোমরে পিস্তল এঁটে বাইরে বেরিয়ে গেছেন বাবা।
আজ তাঁর বড় ব্যস্ততার দিন।
তসলিমও ব্যস্ত।
তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার পথে সালমার সঙ্গে দেখা হলো তসলিমের।
আজ বাইরে না গেলেই কি নয় ?
এই একটি কথা বলার জন্যে হয়তো সিঁড়ির গোড়ায় অপেক্ষা করছিলো মেয়েটি।
তসলিম থমকে দাঁড়ালো।
তুমি তো সবই জানো সালমা। জানো, আমি যাবো। তবু কেন বাধা দিচ্ছো।
দৃষ্টি নত করলো সালমা।
খালু বলছিলেন আজ গোলমাল হতে পারে।
বলতে গিয়ে গলার স্বরটা কেঁপে গেলো তার।
তসলিম সেটা লক্ষ করলো।
এ-মুহূর্তে অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে করছিলো তার।
কিছুই বলতে পারলো না। শুধু বললো—
চলি সালমা। আবার দেখা হবে।
বলে সালমার দিকে আর তাকালো না সে। নীরবে বেরিয়ে গেলো।

এরা মানুষ !
মানুষ না সব জানোয়ার।
রাস্তার মধ্যে একরাশ থু-থু ছিটালো কবি আনোয়ার হোসেন।
সব শালা বেঈমান। টাকা খেয়ে হরতাল ভেঙে দিয়েছে। বুঝবে। যেদিন ওদের ঘাড়ে উর্দুর জোয়াল চাপিয়ে দেয়া হবে, সেদিন বুঝবে শালারা।
রাগে থরথর করে কাঁপছিলো কবি আনোয়ার হোসেন।

যাবেন নাকি সার।
তাকে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটা রিকশাওয়ালা শুধালো।
না।
সহসা বিকটভাবে চিৎকার করে উঠলেন কবি আনোয়ার হোসেন।
তার ইচ্ছে হলো এক ঘুসিতে রিকশাওয়ালার নাক, মুখ ভেঙে দিতে !
সব শালা বেঈমান। মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ।
রাস্তায় থু-থু ছিটিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন তিনি।

তখন দুপুর।
আকাশে একটুকরো মেঘ নেই।
সূর্যটা জ্বলছে।
ছাত্ররা সবাই স্কুল-কলেজ বর্জন করে দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে একে-একে এসে জমায়েত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়।
মধুর রেস্তোরাঁ।
ইউনিয়ন অফিস।
পুকুরপাড়।
গমগম করছে অসংখ্য কণ্ঠস্বরে।
বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সামনের রাস্তায় ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলো নিচে অনেকগুলো পুলিশের গাড়ি সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে।

পুলিশের কর্তারা পায়চারি করেছেন রাস্তায়।
আর কন্সটেবলগুলো হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।
রাইফেলের নলগুলো দুপুরের রোদে চিকচিক করছে।
ইউক্যালিপ্টাসের ডাল থেকে অসংখ্য পাতা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে নিচে।
সহসা অসংখ্য কণ্ঠের চিৎকারে চমকে সেদিকে তাকালেন পুলিশের বড়কর্তারা।
আমতলায় ছাত্রদের সভা শুরু হয়েছে।
আমরা কোনো কথা শুনতে চাই না।
কোনো বক্তৃতার এখন প্রয়োজন নেই।
আমরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙবো।
ভাঙবো।
ভাঙবো।।
অনেকগুলো কণ্ঠ বজ্রের মতো ধ্বনি তুললো।
নেতারা বলছেন—
না, একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙা যাবে না। আইন অমান্য করা ঠিক হবে না। আমরা স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালাবো। স্বাক্ষর সংগ্রহ করেই আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাবো।
না !
না !!
না !!!
আমরা তোমাদের কথা মানবো না।

বিশ্বাসঘাতক !
এরা সব বিশ্বাসঘাতক !!
তোমাদের কথা আমরা শুনতে চাই না।
আমরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙবো।
আইনের বেড়ি আমরা ভাঙবো।
ভাঙবো !
ভাঙবো !!
ভাঙবো !!!
অসংখ্য কণ্ঠের চিৎকারে চমকে উঠলেন পুলিশের বড়কর্তারা।
পিস্তলে হাত রাখলেন।
ছোটকর্তারা ছুটে এসে দাঁড়ালেন কন্সটেবলগুলোর পাশে।
সেপাইদের চোখেমুখে কোনো ভাবান্তর নেই।
হুকুমের ক্রীতদাস ওরা।
কর্তাদের মুখের দিকে নির্লিপ্ত-দৃষ্টিতে চেয়ে।
সূর্য জ্বলছে।
রাইফেলের নলগুলো চিকচিক করছে রোদে।
ইউক্যালিপ্টাসের ডাল থেকে পাতা ঝরছে।
কোনো নেতার কথা আমরা শুনবো না।
টেবিলে উঠে দাঁড়িয়ে সহসা চিৎকার করে উঠলো তসলিম।
আমরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙবো, কিন্তু বিশৃঙ্খলভাবে নয়। দশজন দশজন করে আমরা বেরিয়ে যাবো রাস্তায়। মিছিল করে এগিয়ে যাবো এসেম্বলির দিকে। এই আমাদের আজকের সিদ্ধান্ত। এই আমাদের আজকের শপথ।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
অসংখ্য কণ্ঠের গগন-বিদারি চিৎকারে দ্রুত গাড়ি থেকে নিচে নেমে এলেন পুলিশের বড় কর্তারা।
তাদের চোখের ভাষা পড়ে নিতে ছোটকর্তাদের একমুহূর্ত বিলম্ব হলো না।
মুহূর্তে তারা ফিরে তাকালেন কন্সটেবলগুলোর দিকে।
হুকুমের দাস সেপাইগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট লক্ষ করে এগিয়ে এলো রাস্তার মাঝখানে।
প্রথম দশজন ছাত্রের দল তখন তৈরি হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার জন্যে।
একটি ছেলে তাদের নাম-ঠিকানা কাগজে লিখে নিচ্ছে।
প্রচণ্ড শব্দে লোহার গেটটা খুলে গেলো।
পুলিশের দল আরো দু-পা এগিয়ে এলো সামনে।
শপথের কঠিন দীপ্তিতে উজ্জ্বল দশজন ছাত্র।
দশটি মুখ।
মুষ্ঠিবদ্ধ হাতগুলো আকাশের দিকে তুলে পুলিশের মুখোমুখি রাস্তায় বেরিয়ে এলো।
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
সেপাইরা ছুটে এসে চক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ালো ওদের।
সবার বুকের সামনে একটা করে রাইফেলের নল চিকচিক করছে।

আমতলা।
মধুর রেস্তোরাঁ।
ইউনিয়ন অফিস।
পুকুরপাড়।
চারপাশ থেকে ধ্বনি উঠলো—
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
ততক্ষণে ছাত্রদের দ্বিতীয় দলটা বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়।
তৃতীয় দল এলো।
চতুর্থ দল এলো।
ধরে ধরে সবাইকে দুটো খালি ট্রাকের মধ্যে তুলে নিলো সেপাইরা।
পুলিশের বড়কর্তাদের চোখেমুখে উৎকণ্ঠা।
কত ধরবো ?
কত নেবো জেলখানায় ?
ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো বাইরে বেরিয়ে আসছে ছাত্ররা।
সহসা চোখ-মুখ জ্বালা করে উঠলো ওদের।
সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসছে।
দরদর করে পানি ঝরছে দুচোখ দিয়ে।
কে যেন চিৎকার দিয়ে উঠলো—
কাঁদুনে গ্যাস ছেড়েছে ওরা।
চোখে পানি দাও।
অনেকগুলো ছাত্র হুমড়ি খেয়ে পড়লো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরটার ভেতরে।
চোখ জ্বলছে।
পানি ঝরছে।
কেমন যেন ধোঁয়াটে হয়ে গেছে পুরো এলাকাটা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল টপকে ঝাঁকেঝাঁকে ছাত্ররা এগিয়ে গেলো মেডিক্যাল ব্যারাকের দিকে।
কবি আনোয়ার হোসেনের জামাটা একটা লোহার শিকের মধ্যে আটকে ছিঁড়ে গেল।
পেছন ফিরে তাকালেন না তিনি।
চোখমুখ জ্বলছে তাঁর।
জ্বলুক।
ছাত্ররা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে দিয়েছে।
আন্দোলন সবে শুরু হলো। কাঁদুনে গ্যাসের ধোঁয়া দিয়ে তাকে আটকানো যাবে না।
ভাইসব !
সহসা চিৎকার করে উঠলো তসলিম।
আপনারা বিশৃঙ্খলভাবে ছুটোছুটি করবেন না। আপনারা এদিকে আসুন। আমরা মেডিক্যাল ব্যারাকে আবার জমায়েত হবো।
পুলিশের গাড়িগুলো ততক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে সরে গিয়ে মেডিক্যাল ব্যারাকের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

বড়কর্তাদের কাছে হুকুম এসেছে, যেমন করে হোক এ আন্দোলনকে এখানে শেষ করতে হবে।
একটু পরে এসেম্বলি বসবে।
এমএলএ-রা সবাই আসবেন।
তাদের আসার আগে পথ পরিষ্কার করে দিতে হবে।
ছাত্রদের সরিয়ে দিতে হবে পুরো এলাকা থেকে।
বড়কর্তারা আরো সেপাহি চাইলেন।
আরো গাড়ি চাইলেন।
আরো গাড়ি এলো।
আরো সেপাহি এলো।
আরো অস্ত্র এলো।
সঙ্গে সঙ্গে আরো ছাত্র এলো।
আরো কঠিন শপথে হলো দীপ্ত ওদের মুখ।
মেডিক্যাল কলেজের সামনের রাস্তাটা প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রের অবয়ব নিয়েছে।
বিলকিস বানুর গাড়িটা ঘিরে দাঁড়ালো একদল ছাত্র।
এদিকে কী হচ্ছে—ঘুরে দেখবার বাসনা নিয়ে দেখতে এসেছিলেন বিলকিস বানু।
কিন্তু ছাত্রদের হাতে এভাবে ধরা পড়ে যাবেন ভাবতেও পারেননি।
তার গাড়ির চাকা থেকে বাতাস ছেড়ে দেয়া হলো।
কাচগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো ছাত্ররা।
আপনার সাহস তো কম নয়। লিপস্টিক মেখে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছেন! জানেন না আজ হরতাল?
আমি কিছু জানি না। কিচ্ছু জানতাম না। বিশ্বাস করুন।
ভয়ে আর আতঙ্কে গলাটা শুকিয়ে গেলো বিলকিস বানুর।
ঝড়ে ভেজা কাকের মতো থরথর করে কাঁপছেন তিনি।
মেয়েমানুষ, আপনাকে মাপ করে দিলাম। গাড়ি এখানে থাকবে। পায়ে হেঁটে যেখানে যাবার চলে যান।
মুহূর্তে গাড়ির কথা ভুলে গেলেন বিলকিস বানু।
গাড়ির চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি।
বেঁচে থাকলে অনেক অনেক গাড়ি হবে তার।

একটা পুলিশও ছিলো না ওখানে?
রাগে চোখমুখ লাল হয়ে গেলো মকবুল আহমদের।
দু-চোখে পানি ঝরছে বিলকিস বানুর।
আমার চুল টেনে দিয়েছে ছাত্ররা।
আমার মুখে থু-থু দিয়েছে ছাত্ররা।
আমার গাড়িটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।
রাগে কাঁপতে কাঁপতে রিসিভার তুলে নিলেন মকবুল আহমদ।
পুলিশের বড়কর্তাকে ফোনে পেয়ে রীতিমতো গালাগাল দিলেন তিনি।

গুণ্ডা বদমায়েশরা রাস্তাঘাটে মেয়েছেলেদের ধরে-ধরে অপমান করছে। দেখতে পাচ্ছেন না? কী করছেন আপনারা?
কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠিতে যদি কাজ না হয়, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে? গুলি করে ওদের খুলি উড়িয়ে দিতে পারছেন না?

মেডিক্যাল ব্যারাকের উপর তখন অজস্র কাঁদুনে-গ্যাসের বর্ষণ চলছে।
স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দ্বিগুণ গতি নিয়েছে।
এসেম্বলির দিকে একটা মাইক্রোফোন লাগিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে তসলিম।
তার দিকে চেয়ে-চেয়ে বিড়বিড় করে বললেন কবি আনোয়ার হোসন—
আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে। কার শক্তি আছে একে স্তব্ধ করে দেয়?

মেডিক্যালের রাস্তায় অংসখ্য ইটের টুকরো ছড়ানো।
পুলিশ আর ছাত্রদের মধ্যে এখন ইটের যুদ্ধ চলছে।
পুঁটলিটা বগলে নিয়ে অবাক চোখে সেদিকে চেয়ে রইলো গফুর।
কী হচ্ছে এসব?
ভাবার চেষ্টা করলো।
কিন্তু নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধি দিয়ে কারণ নির্ণয় করতে পারলো না।
সূর্যটা ঈষৎ ঢলে পড়েছে পশ্চিম।
আকাশে তখনো একটুকরো মেঘ নেই।
পলাশের ডালে সোনালি রোদ লালরঙ মেখে নুয়ে পড়েছে পথের দু-পাশে। কয়েকটা কাক তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে মেডিক্যালের কার্নিশে বসে।
এতক্ষণ বাতাস ছিলো।
মুহূর্ত-কয়েক আগে তাও বন্ধ হয়ে গেছে।
সহসা শব্দ হলো।
গুলির শব্দ।
আবার!
আবার!!
মুহূর্তে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।
ছাত্র।
জনতা।
মানুষ।
এক ঝলক দমকা বাতাস হঠাৎ কোত্থেকে যেন ছুটে এসে ধাক্কা খেলো ব্যারাকের এক-কোণে দাঁড়ানো আমগাছটিতে।
অনেকগুলো মুকুল ঝরে পড়লো মাটিতে।
কাকগুলো চিৎকার থামিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।
তারপর একটা কাক ভয়ার্ত ডানা মেলে আকাশে উড়লো।
আকাশে তখনো গনগনে রোদ।
শহরের সমস্ত আকাশ জুড়ে উড়তে লাগলো কাকটা।
কোথাও কোনো শব্দ নেই।
শুধু একটি ভয়ার্ত কাক আর্তশব্দে উড়তে থাকলো আকাশে।
ঈশানকোণ থেকে ভেসে এলো একটুকরো কালো মেঘ।

সহসা সেই মেঘের আড়ালে মুখ লুকালো সূর্য।

খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো পুরো শহরে।
ওরা গুলি করেছে।
ছাত্রদের উপরে গুলি চালিয়েছে ওরা।
ক'জন মারা গেছে?
হয়তো একজন। কিম্বা দুজন। কিম্বা অনেক। অনেক।
দোকান-পাটগুলো সব ঝড়ের বেগে বন্ধ হতে শুরু হলো।
দোকানিরা নেমে এলো রাস্তায়।
বাসের চাকা বন্ধ।
কল-কারখানা বন্ধ।
বিকট শব্দে হুইসেল বাজিয়ে ইঞ্জিন ছেড়ে নিচে নেমে এলো ট্রেনের ড্রাইভাররা।
আজ চাকা বন্ধ।
রিকশাটা একপাশে ঠেলে রেখে খবরটা যাচাই করার জন্যে সামনের একটা পান-দোকানের দিকে এগিয়ে গেলো সেলিম।
সে-ও আজ রিকশা চালাবে না।
ওরা নাকি ছাত্রদের উপর গুলি করেছে। কতজন মারা গেছে?
হিসাব নেই।
সবাই খোঁজ নিতে এগিয়ে গেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।
মেডিক্যালের দিকে।
এটা অন্যায়।
এই অন্যায় আমরা সহ্য করবো না।
মেডিক্যালের কাছাকাছি এসে জনতা এক বিশাল মিছিলে পরিণত হলো। ক্ষুব্ধ আক্রোশ ফেটে পড়ছে মানুষগুলো।
এ হত্যার বিচার চাই আমরা।
যারা আমাদের ভাইদের খুন করেছে তাদের বিচার চাই আমরা।

ধীরেধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।
ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল পুরো শহরটা।
সেই অন্ধকারকে আশ্রয় করে দুটো এম্বুলেন্স নিয়ে মেডিক্যালের পেছনে মর্গের সামনে এসে দাঁড়ালো কয়েকজন পুলিশ অফিসার।
মৃতদেহগুলো রাতারাতি সরিয়ে ফেলতে হবে।
ভোর হবার আগেই আজিমপুরায় কবর দিয়ে দিতে হবে ওদের।
সারাশরীর ঘামছে।
পকেট থেকে রুমাল বের করে বারকয়েক মুখ মুছলেন আহমেদ হোসেন।
লাশগুলোর নাম ধাম ঠিকানা যদি কিছু থেকে থাকে লিখে নাও।
কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না স্যার।
জবাব দিলেন জনৈক সহকারী।
একজনের কাছে একটা পুঁটলি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে দুটো শাড়ি, কিছু চুড়ি, আর একটা আলতার শিশি। এগুলো কী করবো স্যার?

রেখে দাও। কাল অফিসে জমা দিয়ে দিয়ো। লাশগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নাও গাড়ির ভেতরে। এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।
লাশগুলো একবার দেখবেন কি স্যার ?
আরেক সহকারী প্রশ্ন করলেন।
না। প্রয়োজন নেই।
শান্তগলায় জবাব দিলেন আহমেদ হোসেন।
রুমালে আবার মুখ মুছলেন তিনি।
ছেলে তসলিমের মূর্খতার জন্য এতদিন প্রমোশন বন্ধ হয়েছিলো।
এবার সরকার হয়তো মুখ তুলে তাকাবেন তাঁর দিকে।
মনে মনে ভাবলেন তিনি।
মৃতদেহগুলো গাড়ির মধ্যে তোলা হচ্ছে।
সহসা একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে চমকে উঠলেন আহমেদ হোসেন।
সমস্ত শরীরটা মুহূর্তে যেন হিম হয় গেলো তাঁর।
শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে অতি ক্ষীণস্বরে তিনি ডাকলেন—
দাঁড়াও।
মুহূর্তে যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেলো।
মাতালের মতো টলতে টলতে মৃতদেহের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।
টর্চ ! টর্চটা দেখি!!
জনৈক সহকারী টর্চটা জ্বেলে মৃতদেহের উপর ধরলেন।
মৃত তসলিমের রক্তাক্ত মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন আহমেদ হোসেন।
চেনেন নাকি স্যার ?
একজন সহকারী প্রশ্ন করলেন তাঁকে।
আহমেদ হোসেন বোবাদৃষ্টিতে একবার তাকালেন শুধু তার দিকে।
কিছু বলতে গিয়ে মনে হলো জিহ্বাটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে।
কিছুতেই নাড়াতে পারছেন না তিনি।

ডুকরে কেঁদে উঠলেন মা।
এ কী সর্বনাশ হয়ে গেলো আমার ! আমি এবার কী নিয়ে বাঁচবো !!
ছোট ভাইবোনগুলো মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে।
জানালার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে সালমা।
বাইরের আকাশটার দিকে তাকালো সে।
বুকে তার এক অব্যক্ত যন্ত্রণা।
আর একটা দিনও কি বেঁচে থাকতে পারতো না তসলিম !
কেন সে এমন করে মরে গেলো ?

মেডিক্যালের সবগুলো ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে দেখলো সালেহা।
নেই।
এখানে নেই।
থানায় গেলো।
জেলগেটে বন্দিদের খাতা খুলে নাম পড়লো সবার।

নেই।
এখানেও নেই।
শূন্যঘরে ফিরে এসে সারারাত অপেক্ষা করলো সালেহা।
ভোরের কাক ডেকে উঠলো।
কেউ এলো না।
কান্নায় ভেঙে পড়লো সালেহা।
নেই।
সে বুঝি আর এই পৃথিবীতে নেই।

কলসি কাঁখে পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে রইলো আমনা।
দিন গেলো।
রাত গেলো।
লোকটা যে বিয়ের বাজার করতে সেই-যে শহরে গেলো, কই আর তো এলো না।
নকশি কাঁথার কত ফুল।
কত পাখি!
রঙিন সুতো দিয়ে আঁকলো আমেনা।
রাতে কোনো বাড়িতে পুঁথিপড়ার শব্দ শুনলে হঠাৎ চমকে ওঠে আমেনা।
চোখের পাতা পানিতে ভিজে যায়।

সূর্য উঠছে।
সূর্য ডুবছে।
সূর্য উঠছে।
সূর্য ডুবছে।
সুতোর মতো সরু পানির লহরি বালির উপর দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে।
ধলপহরের আগে রাস্তায় নেমে এলো একজোড়া খালি পা।
সুতোর মতো সরু পানি ঝরনা হয়ে বয়ে যাচ্ছে এখন।
কয়েকটি খালি পা কংক্রিটের পথ ধরে এগিয়ে আসছে সামনে।
ঝরনা এখন নদী হয়ে ছুটে চলেছে সাগরের দিকে।
সামনে বিশাল সমুদ্র।
সমুদ্রের মতো জনতা।
নগ্নপায়ে এগিয়ে চলেছে শহীদ মিনারের দিকে।
অসংখ্য কালো পতাকা।
পতপত করে উড়ছে।
উড়ছে আকাশে।
মানুষগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অসংখ্য ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে সামনে।
ইউক্যালিপ্টাসের পাতা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে নিচে। মাটিতে।
ঝরে।
প্রতি বছর ঝরে।
তবু ফুরোয় না।